দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনায়
মা দুর্গাই রাষ্ট্রপ্রতিমা
— পৃঃ ১৩

জনগণই পারে
দলবদলুদের উচিত
শিক্ষা দিতে — পৃঃ ৪৫

৭৪ বর্ষ, ৭ সংখ্যা।। ১১ অক্টোবর, ২০২১।। ২৪ আশ্বিন- ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩।। website : www.eswastika.com

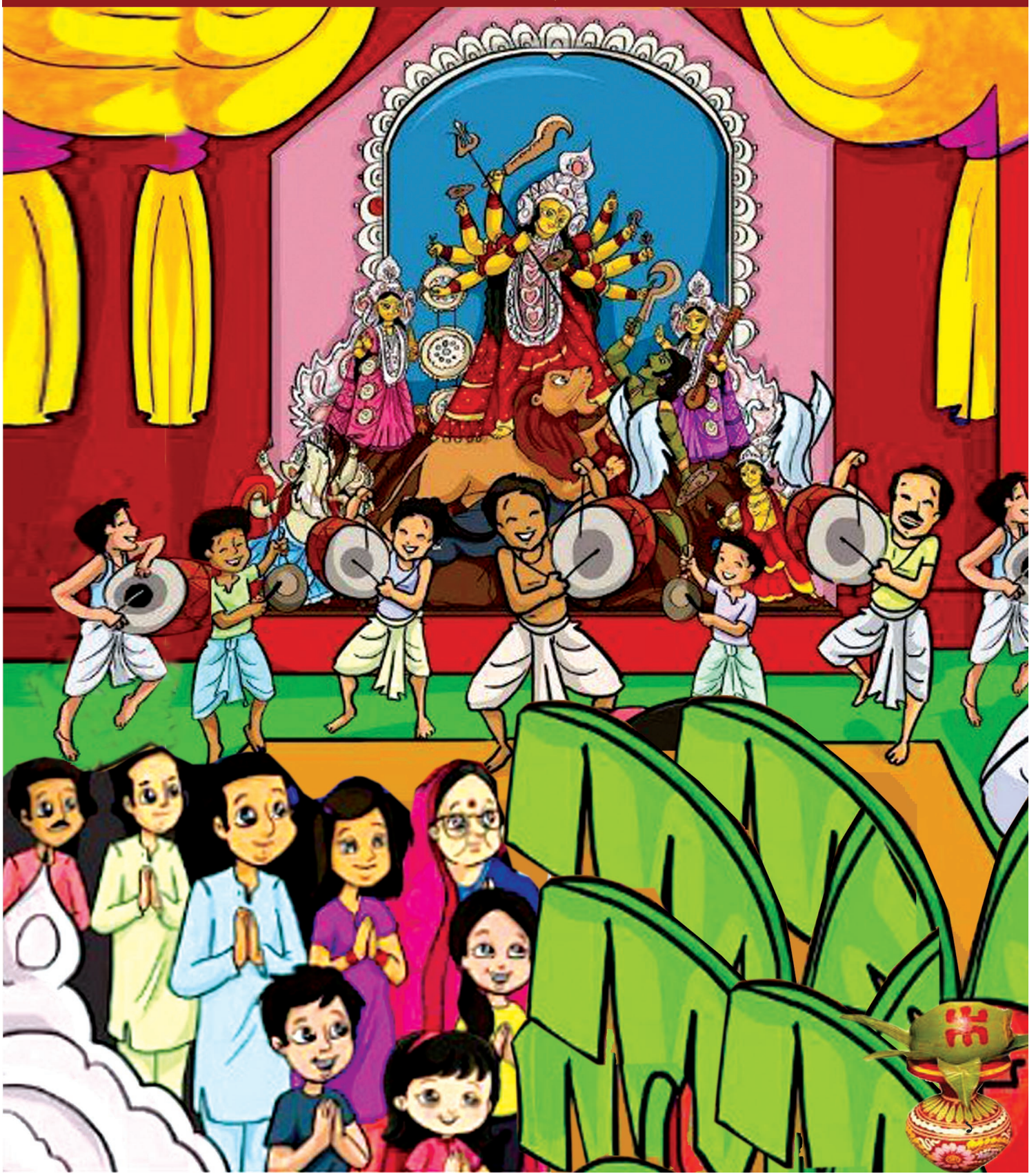

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ৭ সংখ্যা, ২৪ আশ্বিন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

১১ অক্টোবর - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

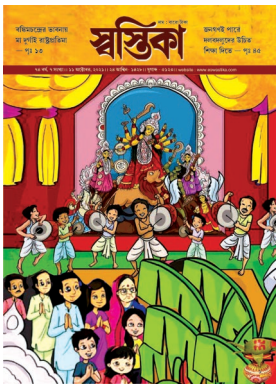

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

'দিল্লি বহুত দূর হ্যায়', কিন্তু এ অন্যায় লুকাবো কোথায়?
☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

কংগ্রেস মুক্তির অপেক্ষায় দেশ ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

ডিজিটাল পদ্ধতিতে রোগীর তথ্য সংরক্ষণ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ
☐ ডাঃ দেবী শেঠী ☐ ৮

বিজ্ঞানে আবেগ পুরাণে মায়া ☐ নিখিল চিত্রকর ☐ ১১

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনায় মা দুর্গাই রাষ্ট্র প্রতিমা
☐ ডাঃ নিত্যগোপাল চক্রবর্তী ☐ ১৩

একবার গণেশের ভুঁড়িতে আঙুল ঢুকিয়ে দেখেছিলাম কতটা যায়
☐ বিজয় আঢ্য ☐ ১৫

সার্বজনীন দুর্গোৎসব এবং তারপর... ☐ কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ১৬

পুজোর দিনগুলিতে ভলেন্টেয়ারি করে সব থেকে বেশি মজা পেতাম
☐ রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ২৭

পুজোমণ্ডপে অল্পবয়েসিদের সেলফি তোলা দেখতে ভালো লাগে
☐ নীলাঞ্জনা রায় ☐ ১৮

তুষ্টুর গড়া সিংহ হাঁ করে লাফ মারত ☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ২৩

নবমীর রাতকে মেন 'কালরাত্রি' মনে হতো ☐ দুর্গাপদ ঘোষ ☐ ২৪

ছেলেবেলার দুগ্গাপুজোটাকে ছুঁতে চাই, পাই না ☐ সুজিত রায় ☐ ২৫

সেই শারদীয় পুলক আর এই শারদীয় প্রদাহ ☐ শেখর সেনগুপ্ত ☐ ২৬

ছিলাম ভলেন্টিয়ার হলাম সেবক, অসুর বধ-ই আসলি কাম'
☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ২৭

পূজার দিনগুলির হর্ষ ও বিষাদময় স্মৃতি আজও অমলিন
☐ গোপাল চক্রবর্তী ☐ ২৮

নাপিত ঝোলা থেকে আয়না বের করে ছোটোদের মুখ দেখিয়ে যেতেন
☐ করুণা প্রকাশ ☐ ২৯

মহালয়া : বিশ্ব-মঙ্গলের আন্তরিক আকুতি ☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ৩১

খিদিরপুর 'বাকুলিয়া হাউস'-এর ঐতিহ্যপূর্ণ দুর্গাপুজো
☐ সপ্তর্ষি ঘোষ ☐ ৩৫

স্মৃতিপটে দুর্গাপূজার সেকাল-একাল ☐ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৩৬

মা দুর্গা এখন মোবাইলে আবদ্ধ ☐ অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৩৭

ইতিহাসে হারিয়ে যাওয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের তিন কন্যা
☐ রিয়া রায় ☐ ৩৮

সর্বভারতীয় রাজনীতির জল ঘুলিয়ে মাছ ধরতে চাইছে তৃণমূল
☐ বিশ্বামিত্র ☐ ৪৩

জনগণই পারে দলবদলুদের উচিত শিক্ষা দিতে
☐ মণীন্দ্রনাথ সাহা ☐ ৪৫

সিন্ধু সভ্যতা কি বহিরাগত আর্য আক্রমণে ধ্বংস হয়েছিল?
☐ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ☐ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সমাবেশ সমাচার : ৩০ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ চিত্রকথা ☐ ৫০

প্রকাশিত হবে
১ নভেম্বর
২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১ নভেম্বর
২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শক্তিসাধনা

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা দীপাবলী সংখ্যা। বাঙ্গলা ও বাঙ্গালির শক্তিসাধনা নিয়ে লিখবেন গোপাল চক্রবর্তী, সুজিত রায় প্রমুখ।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

With Best Compliments from :

A
Well Wisher

সম্পাদকীয়

দশপ্রহরণ ধারিণী

শরৎকাল। মা আসিতেছেন। মাকে বরণ করিবার জন্য প্রকৃতিদেবীও অপরূপ সাজে সাজিয়াছেন। শরৎ তো মায়ের আগমনী বার্তাই বহন করিয়া আনে। কারোনার ভয়াল ভ্রূকুটি সত্ত্বেও মায়ের আবাহনের সমস্ত আয়োজনই পূর্ণ হইয়াছে। ষষ্ঠী হইতেই মাতৃদর্শনে নামিবে মানুষের ঢল। ছোটো-বড়ো সকলেই আনন্দে মাতিয়া উঠিবে। কিন্তু বড়োরা তাহার সঙ্গে মাতিবে তাহাদের ছোটোবেলার স্মৃতির রোমন্থনে। তাহা বড়ো মধুর। বার বার সেই স্মৃতি রোমন্থন করিয়াও যেন আশ মেটে না। হর্ষ-বিষাদের সেই স্মৃতি বড়োই সুখের , বড়োই আনন্দের। প্রৌঢ় বয়সে উপনীত হইয়া সেই পুরাতন ছবিটি যেন আজিকার দিনে খাপ খাইতে চাহে না। কোথাও যেন শূন্যতা অনুভব হইতেছে। কোথাও যেন রিক্ততা। আজিকার পূজায় আড়ম্বর রহিয়াছে, জৌলুস রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের স্পর্শটুকু যেন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জগজ্জননীর আরাধনায় আজ ভক্তিভাবের প্রকাশ উধাও হইয়াছে। খুঁটিপূজা হইতে পূজার উদ্বোধন সর্বত্রই রাজনীতির মানুষের ভিড়। পূজার কয়েক মাস আগে হইতেই চাঁদার মানে অসুরবাহিনীর চোখরাঙানি। তখনই মনের অগোচরে উঁকি মারে মহিষাসুরেরা বোধহয় মায়ের পূজায় মাতিয়াছে! পূজার মণ্ডপে মণ্ডপে ভক্তিভাবের নামমাত্র নাই, যেন উদ্ধত প্রতিস্পর্ধার প্রতিফলন। সবচাইতে পীড়াদায়ক হইয়াছে থিমপূজার নামে শক্তিময়ীর আরাধনার অন্তর্নিহিত ভাবটির জলাঞ্জলি। নিশ্চিতভাবেই মনে হইতেছে বাঙ্গালি জাতিকে নপুংসক বানাইবার ইহা এক সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। এই চক্রান্তের একটি দিক হইতেছে স্থানে স্থানে অস্ত্রবিহীন মা দুর্গার পূজা। ইহা সপ্তশতী চণ্ডীমন্ত্রের উল্লঙ্ঘন । ইহা শাস্ত্রমতে পূজার বিপরীত। ইহা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত রাষ্ট্রগীত 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী'-র অবমাননা। থিমপূজার উদ্যোক্তারা ভুলিয়া যান যে, দেবীর দশ হাতে দশ অস্ত্র ও আনুষঙ্গিক বস্তুগুলি বিভিন্ন প্রতীকের ইঙ্গিতবাহী। দুর্গাপূজার পুরোহিত মায়ের হস্তস্থিত অস্ত্রশস্ত্রগুলিকে নির্দিষ্ট মন্ত্রে পূজা করিয়া সেগুলির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। সেই প্রাণবন্ত অস্ত্র দ্বারাই মা শত্রু নিধন করিয়াছেন। শারদীয়া দুর্গার আরাধনা করিয়া অন্তরস্থিত শত্রুকে জয় করিয়া বাঙ্গালিজাতি নববলে বলীয়ান হইয়া ওঠে। মা দুর্গা জগজ্জননী। নিরানন্দের মাঝে আনন্দদায়িনী। সম্পদে ও বিপদে সকলের শান্তি ও কল্যাণের মহাশক্তি তিনি। সেই মহাশক্তির আরাধনা করিয়া বাঙ্গালি স্বাধীনতাযুদ্ধে অকুতোভয়ে অস্ত্র ধারণ করিয়া দেশমাতৃকাকে শৃঙ্খল মুক্ত করিয়াছে। বর্তমানে মাতৃ আরাধনার মূল ভাব হইতে সরিয়া আসিয়া বাঙ্গালি তাহার আনুষঙ্গিকে মাতিয়াছে। আরও একটি চক্রান্ত ইদানীং শুরু হইয়াছে। দুর্গাপূজা আসিলেই ভারতবিরোধী তথা হিন্দুবিরোধী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর দল ব্যস্ত হইয়া পড়েন বিভিন্ন মাধ্যমে আর্য-অনার্যের মনগড়া উপাখ্যান পরিবেশনে এবং তাহার সঙ্গে অবশ্যই হিন্দুধর্মের দোষানুসন্ধানে। তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া থাকেন যে, শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বাঙ্গালি মানসের কোনও সম্পর্ক নাই । কিন্তু আপামর বাঙ্গালি জানেন যে, শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রচলন করিয়াছিলেন শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বাঙ্গালি যত শীঘ্র ইহাদের মুখোশ খুলিয়া দিতে পারিবেন ততই মঙ্গল।

বড়ো বড়ো প্যান্ডেলে, বড়ো বড়ো প্রতিমায় দুর্গাপূজা হোক, আলোর রোশনাই চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠুক, আনন্দ-উদ্দীপনার বান ডেকে যাক, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীর নিজস্বী তোলা চলুক, আর এইগুলির সঙ্গেই আবার ফিরিয়া আসুক পূজার সাত্ত্বিক পরিবেশ, শাস্ত্রাচার সম্মত, ভক্তিভাবে মায়ের অরাধনা। বন্ধ হোক চাঁদার নামে জুলুমবাজি। পূজা মণ্ডপে দাঁড়িয়ে অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে বাঙ্গালি প্রার্থনা করুক-- দেবি! প্রসীদ পরিপালয় নোহরিভীর্তেনিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ। পাপানি সর্বজগতাঞ্চ প্রশমং নয়াশু উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্।। হে দেবি! আপনি প্রসন্ন হোন। যেভাবে আপনি অসুরদের ধ্বংস করে আমাদের রক্ষা করেছেন, সেভাবেই শত্রুদের ভয় থেকে আমাদের রক্ষা করুন। সমগ্র বিশ্বের পাপ নষ্ট করুন এবং উৎপাত ও পাপের ফলস্বরূপ মহামারীর প্রাদুর্ভাবকে নাশ করুন।

সুভাষিতম্

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।

তদা তদাঽবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্। (শ্রীশ্রীচণ্ডী)

এরকম যখনই পৃথিবীতে দানবদের দ্বারা বাধা সৃষ্টি হবে, তখনই আমি অবতীর্ণ হয়ে শত্রুদের ধ্বংস করব।

‘দিল্লি বহুত দূর হ্যায়’, কিন্তু এ অন্যায় লুকনো কোথায়?

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

এই প্রতিবেদন লেখার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবানীপুর নির্বাচনের ফল বেরোতে দু’দিন বাকি। নন্দীগ্রামের পরজয়ের গ্লানি মুছে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বেঁচে থাকতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মরিয়া। তাই ঘরের মেয়ে হয়ে ভবানীপুরে নির্বাচন লড়ছেন। এপ্রিলে প্রথম নির্বাচনে পরাজিত হয়েও ৫ মে মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নেন মমতা। হারের নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে তিনি সরে দাঁড়াননি। অথচ ২০০১ সালে তহলকা পোর্টাল ঘুষকাণ্ডের নৈতিক দায়িত্ব নিয়েই তিনি বাজপেয়ী মন্ত্রীসভা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। সে ছিল অন্য মমতা।

২০১১-তে বঙ্গ জয়ের পর থেকেই মমতা পালটে যান। অনেক তৃণমূল নেতাই আড়ালে আবডালে বলেন ‘এ মমতা সে মমতা নয়’। ১৯৮০-১৯৯০ সালে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও বলতেন ‘মনে রাখবেন এ কংগ্রেস সে কংগ্রেস নয়।’ জ্যোতিবাবুর সুনাম ছিল তিনি দুটো দল চালাতেন— সিপিএম আর কংগ্রেস। মমতা সেই কংগ্রেসে ছিলেন। রাজ্য নেতাদের ‘তরমুজ’ বলে ১৯৯৮-এ বেরিয়ে আসেন। তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করেন।

মমতার ব্যাপারে তৃণমূল নেতাদের সাফ জবাব ‘উনি ১টি আসনে হেরেছেন। ২১৩টি জিতেছেন। তাই নৈতিক দায়িত্বের কোনো ব্যাপার নেই। আমরা চোখ বুজে থাকব। তৃণমূল মানেই মমতা। মমতা মানেই তৃণমূল।’ ১৯৭৬ সালে জরুরি অবস্থার সময় কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া বলেছিলেন ‘ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া’।

মমতার দিল্লির রাস্তা ভবানীপুর হয়ে। তাই এ নির্বাচন তাঁকে জিততেই হবে। না হলে নন প্লেয়িং ক্যাপটেন হয়ে সাইডলাইনে বসে থাকতে হবে। নন্দীগ্রামের চ্যালেঞ্জ হারার সময় মমতা নিশ্চিত জানতেন না তাঁর দল এত বড়ো ভাবে জিতবে আর তিনি নিজে হেরে যাবেন। কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে তিনি বলতেন আমরা ২০০-র ওপর আসন পাব।

বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও স্লোগান দিয়েছিলেন ‘ইসবার ২০০ পার’ অর্থাৎ ২০২১-এর রাজ্য নির্বাচনে বিজেপি ২০০-র বেশি আসন পাবে। দল জেতার ক্ষেত্রে মমতা সঠিক হলেন। কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে বেঠিক প্রমাণিত হলেন। আর সেখানে বিপত্তি। অসহিষ্ণু মমতা নজিরবিহীনভাবে মুখ্যসচিবকে দিয়ে নির্বাচন কমিশনে চিঠি লেখালেন। তাঁর স্বার্থ চরিতার্থ হলো। ফাঁদে পড়লেন অসহায় মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। হাইকোর্ট তাকে ভৎর্সনা করে দলদাস বলল। ১৭ নভেম্বর নতুন শুনানির সময় হয়তো তাঁর জরিমানা হবে। তবে তার মধ্যে ভবানীপুর নির্বাচনের ফল বেরিয়ে যাবে।

নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ-র বিজেপি— সংসদে প্রায় ৫৬ শতাংশ আসন আর সারা দেশে ৩৭.৩৬ শতাংশ ভোট। মমতার তৃণমূলকে তাই দেখতে হচ্ছে দূরবিন দিয়ে।

মমতা জিতুন বা হারুন মুখ্যসচিবকে ‘বলির বখড়া’ করার নজির রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে ‘কালো দাগ’ হিসাবে থেকে যাবে। বিনিময় দ্বিবেদি কি পুরস্কার পাবেন? পুরস্কার দিয়ে কি এ অন্যায় ঢাকা যাবে? দিল্লির রাজনৈতিক অলিন্দে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিরোধী মুখ মমতা। মুখে না বললেও মনে সেটাই ইচ্ছা। তৃণমূল নেতারাও তাই বলেন। তবে তা করতে গেলে মমতাকে সংসদে আসন সংখ্যা বাড়াতে হবে। ২২ থেকে অন্তত ৩৫ হতেই হবে। এ ব্যাপারে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন অনেকটাই এগিয়ে।

সংসদে ডিএমকে-র ৩৮ আসন আছে। ২০১১ পর্যন্ত মমতা জোট করে এগিয়েছেন। নাম ছিল ‘জোট মমতা’। কখনও বিজেপি কখনও বা কংগ্রেস। কিন্তু ২০১৯-এ মহাজোট করতে গিয়ে তিনি ডাহা ফেল করলেন। ২০২৪-এ তাই আবার চেষ্টা করছেন। তবে আমার মনে হয় না দিল্লি তার কাছে অত সহজে ধরা দেবে। কারণ সংসদে মাত্র ৪.০৭ শতাংশ আসন দখল করে আর সারা দেশের মাত্র ৩ শতাংশের কাছাকাছি ভোট পেয়ে মমতার দিল্লি দখল এখন অবধি ‘মিথ্যা আশা কুহকিনী’, কারণ ‘দিল্লি বহুত দূর হ্যায়’।

সামনে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ-র বিজেপি— সংসদে প্রায় ৫৬ শতাংশ আসন আর সারা দেশে ৩৭.৩৬ শতাংশ ভোট। মমতার তৃণমূলকে তাই দেখতে হচ্ছে দূরবিন দিয়ে।

কংগ্রেস মুক্তির অপেক্ষায় দেশ

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

এই চিঠি লেখার কথা ছিল কংগ্রেসের হাই কমান্ডকে। কিন্তু কাকে যে লেখা যায় সেটাই ঠিক করা যাচ্ছে না। তাই আপনাদের শরণ। যা দেখা যাচ্ছে তাতে এখন কংগ্রেসের অন্দরমহল যেন বিভ্রান্তির আসর। কে আছেন, কে নেই এই নিয়ে প্রতিদিনের জল্পনা। দিল্লিতে ২৪ নম্বর আকবর রোডে নানা রকম প্রশ্ন উড়ে বেড়াচ্ছে। কে গান্ধী পরিবারের দিকে, আর কে গান্ধী পরিবারের উলটো দিকে? এখনও গান্ধী পরিবার কাদের উপরে আস্থাভাজন, কাদের উপরে বিরাগভাজন? কারা থাকছেন, আর কারা দল ছাড়তে তৈরি? প্রশ্ন অনেক কিন্তু উত্তর অজানা।

সাম্প্রতিক ঘটনাই দেখুন। সবাইকে অগ্রাহ্য করে রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা নভজ্যোৎ সিংহ সিধুকে পঞ্জাবের প্রদেশ সভাপতি করেছিলেন। কিন্তু তিনি আচমকাই পদত্যাগ করার পরে কপিল সিব্বলের মতো কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ নেতারা সরব হয়েছেন। এখন হাই কমান্ড কি এবার সিব্বলের মতো নেতাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবে? রাহুল শিবিরের রণদীপ সিংহ সুরজেওয়ালা জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডাকা হবে। কিন্তু, শুধুই সিব্বল, না কি তাঁর সঙ্গে বিক্ষুব্ধ জি-২৩ গোষ্ঠীর অন্য নেতাদের উপরেও গান্ধী পরিবারের কোপ পড়বে?

কংগ্রেস নেতাদের একাংশ আশা করছেন, আসন্ন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকেই সভাপতি নির্বাচনের সূচি ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, রাহুল কি সভাপতির দায়িত্ব নেবেন? কংগ্রেসের এক নেতা বলেন, 'দলের সব থেকে বড়ো বিভ্রান্তির বিষয় হলো, সবাই যখন রাহুলকে দলের নেতা মানছেন, তখন তিনি সভাপতি হতে চাইছেন না কেন? আর রাহুল যদি সভাপতিই না হতে চান, তা হলে সব সিদ্ধান্ত নিতে চাইছেন কেন?'

অবশ্য কে কখন কোথায় তা বোঝাই মুশকিল। দিগ্বিজয় সিংহ এতদিন গান্ধী পরিবারের আস্থাভাজন বলেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু পঞ্জাব নিয়ে কংগ্রেসের অন্দরে অস্থিরতার মধ্যেই সদ্য অমিত শাহর প্রশংসা করে জল্পনা বাড়িয়েছেন। দিগ্বিজয়কে সম্প্রতি সোনিয়া গান্ধী দেশজুড়ে বিক্ষোভের পরিকল্পনা বানাতে বলেন। সেই দিগ্বিজয়ই বর্ণনা দিয়েছেন, গুজরাট থেকে মহারাষ্ট্রে যাওয়ার সময়ে জঙ্গলের মধ্যে কীভাবে তাঁর জন্য সাহায্য পাঠিয়েছিলেন অমিত শাহ। তিনি যেখানেই যান, সেখানেই আরএসএস নেতারা তাঁর সঙ্গে এসে আলোচনায় বসেন বলেও দিগ্বিজয় জানান।

দিগ্বিজয়ের আগেই কংগ্রেসের অন্দরে বিভ্রান্তি রয়েছে মমতা সুহৃদ প্রশান্ত কিশোর (পিকে)-কে নিয়ে। পিকে কংগ্রেসে যোগ দেবেন বলে বেশ কিছুদিন ধরেই জল্পনা চলছে। তিনি সোনিয়া-রাহুল-প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে বৈঠকও করেছিলেন। তার আগে পঞ্জাবের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিংহের উপদেষ্টাও ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের ভোটের পরে সেই পদ থেকে ইস্তফা দেন। পঞ্জাবে কংগ্রেস সরকারের জনপ্রিয়তা কমছে বলে পিকে-র সমীক্ষা রিপোর্টের ভিত্তিতেই না কী অমরেন্দ্রকে সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রাহুল-প্রিয়াঙ্কা। আবার কংগ্রেস থেকে লুইজিনহো ফেলেরোকে তৃণমূল কংগ্রেসে আনতে সেই প্রশান্ত কিশোরই প্রধান ভূমিকা নিয়েছেন। কংগ্রেসের অন্দরে প্রশ্ন, পিকে কংগ্রেস ভাঙছেন না গড়ছেন? তিনি কি মমতার লোক না কি কংগ্রেসের?

পঞ্জাবে সিধুর পদত্যাগের পরে সিব্বল প্রশ্ন তুলেছিলেন, কংগ্রেসে কোনও নির্বাচিত সভাপতি নেই, তা হলে সিদ্ধান্ত কে নিচ্ছেন? তার পরেই একদল কংগ্রেস কর্মী সিব্বলের বাড়িতে চড়াও হয়েছিলেন। গুলাম নবি আজাদ, মণীশ তিওয়ারি, আনন্দ শর্মার মতো 'জি-২৩'-র সদস্যেরা তো বটেই, পি চিদম্বরমও এই ঘটনার নিন্দা করেছেন। কিন্তু গান্ধী পরিবারের কেউ এ নিয়ে মুখ খোলেননি। আজ কংগ্রেসের বাইরে থেকে গীতিকার জাভেদ আখতার প্রশ্ন তুলেছেন, রাহুল গান্ধী কেন এই ঘটনার নিন্দা করছেন না? সদ্য কংগ্রেসে যোগ দেওয়া কানহাইয়া কুমার খোলাখুলিই বলেছেন, কংগ্রেস নেতৃত্বের যত সমালোচনা হবে, ততই বিজেপির সুবিধা হয়ে যাবে।

কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, এই কংগ্রেসের ঘাড়ে ভর দিয়েই লোকসভায় ভোটে জিতে দিল্লি
দখলের স্বপ্ন দেখছেন 'ক্ষমতাপ্রিয়' মমতা দিদি। ▫

বিজ্ঞপ্তি

পূজাবকাশের জন্য আগামী ১১ অক্টোবর থেকে ২০ অক্টোবর স্বস্তিকা কার্যালয় বন্ধ থাকবে। ২১ অক্টোবর থেকে যথারীতি কার্যালয় খোলা থাকবে।

— স্বঃ সঃ

অতিথি কলম

ডাঃ দেবী শেঠী

ডিজিটাল পদ্ধতিতে রোগীর তথ্য সংরক্ষণ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ

প্রযুক্তি প্রয়োগের দক্ষ সমর্থক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই নতুন হেল্‌থঅ্যাপ খুলে দিচ্ছেন যা ভারতেই সৃষ্টি করবে আমাদের প্রতিভাবান সফটওয়ার প্রযুক্তিবিদরা। সারা বিশ্ব এই নতুন ভারতীয় হেল্‌থঅ্যাপকে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। কারণ ভারতই হবে পথিকৃৎ।

আজকের আমেরিকায় একটি হাসপাতালে ২০০ রোগী ভর্তি হলে তার মধ্যে অন্তত একজন ভুল চিকিৎসায় মারা যায়। তারা কিন্তু চিকিৎসার অবহেলায় মারা যায় না।

বেলুন ফুলিয়ে আকাশে Skydiving করা নাকি মার্কিনি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার চেয়ে কম বিপজ্জনক বলে সেদেশে কৌতুক চলছে। যদিও আমরা সকলেই জানি যে আমেরিকার হাসপাতালগুলি রোগী ভর্তির ক্ষেত্রে এই গ্রহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিরাপদতম স্থান। অবশ্যই আমাদের হাসপাতালগুলিকে রোগীদের সেরা পরিষেবা প্রদানের উপযুক্ত করে তোলা কর্তব্য। বাস্তবে আমাদের প্রিয়তম কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করলে আমরা সর্বদা উদ্বিগ্নভাবে খোঁজ খবর করি কোন ডাক্তারের অধীনে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু দেখুন, যখন আমরা কোনো বিমানে উঠি আমরা কি পাইলটের হাতযশ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করি বা খোঁজ নিই যে ব্যক্তিটি কে? এর প্রধান কারণ হচ্ছে দুটি পরিষেবা ক্ষেত্রেই একটি কঠোর অনুশাসন মান্য করে চলে।

তবু হাসপাতালের ক্ষেত্রে আলাদা উদ্বেগের কারণ উড়ান ক্ষেত্রে একজন পাইলট একটি উড়োজাহাজকে তার নিজস্ব কোনো শৈলী প্রয়োগ করে ওড়ায় না। ওঠবার সময় বা অবতরণের সময় নিজস্বতা দেখাবার কোনো অবকাশ এখানে নেই। তারা কঠোরতম প্রোটোকল মেনেই ওঠে নামে বা শূন্যে ভেসে থাকে। বিমানের ভেতরে তার চালনা পদ্ধতির প্রতিটি খুঁটিনাটি, তার গতিবিধি সবই ব্ল্যাক বক্সে রেকর্ড হয়। এর কারণ দুর্ভাগ্যবশত বিমানটি যদি দুর্ঘটনায় পড়ে সেক্ষেত্রে ওই কালো বাক্সটিতে রক্ষিত তথ্যাদি উদ্ধার করতে পারলেই দুর্ঘটনার সঠিক কারণ নির্ণয় করা যায়। এই সূত্রে বিমান চালকের কোনো ত্রুটি বিশ্লেষণ ও যাচাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করা গেলে ভবিষ্যতে উড়ানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যায়। উপযুক্ত বাড়তি সাবধানতা অবলম্বনের সুযোগ থাকে। সকলেই জানেন বিমান শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী অবস্থান করে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও তাকে ব্যবহার করার নির্দিষ্ট কঠিন প্রটোকল। আর এই দুটি জিনিসের অত্যন্ত সফল মেলবন্ধনের ফলেই উড়ান শিল্প আজ বিশ্বের মধ্যে অন্যতম নিরাপদ একটি বিশাল ব্যবস্থা।

অপরদিকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট চিকিৎসা প্রটোকল অনুযায়ী চিকিৎসা করা বাস্তবে খুবই কঠিন, কেননা অন্যান্য উন্নয়নশীল ও ভারতের মতো দেশগুলির ৯০ শতাংশ হাসপাতালগুলিতেই রোগীদের সম্পর্কিত ইলেক্ট্রনিক মেডিক্যাল রেকর্ড (ইএমআর) নেই। একটি রোগীর কোন অতীত উপসর্গের পরিণামে তার আজকের রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে তা জানার বিশেষ উপায় নেই। নতুন ব্যবস্থায় অতীত ডাটা পাওয়ার সঙ্গেই বর্তমান রোগ সংক্রান্ত সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার খতিয়ান অত্যাধুনিক মেশিনে সবই নথিবদ্ধ হয়ে যাবে। হাসপাতালের ভেতরে পরীক্ষাগার কর্মী, সেবিকা, টেকনিশিয়ান সর্বোপরি ডাক্তার সকলেই একযোগে রোগীর বিষয়ে ডাটার মাধ্যমে মেশিন খুললেই সম্যক পরিস্থিতি বুঝে যাবেন।

চালু ব্যবস্থায় কোনো একজন রোগীর হঠাৎ কোনো বিশেষ ধরনের জটিলতা দেখা দিলে কেন তার এমন হলো তার সঠিক অনুসন্ধান করা যায় না। কেননা তার শয্যাপার্শ্বে যে কাগজপত্র রিপোর্ট প্রভৃতি থাকে তা থেকে রোগী সম্পর্কে তার আগের অবস্থার বিশ্লেষণ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। নিশ্চিতভাবে নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয় না। রোগ যথাযথভাবে চিহ্নিত করার এই অক্ষমতাই বহু ক্ষেত্রে ডাক্তারদের হতাশাগ্রস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে তাদের প্রতি বিরূপ করে তোলে।

এই সূত্রে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে উত্তরাখণ্ড রাজ্যের উচ্চ আদালত নির্দেশ দেয় যে সে রাজ্যে কোনো চিকিৎসক কাগজের ওপর কোনো ওষুধের নাম লিখতে পারবে না। আদালত বলে তাঁরা ডিজিটালি প্রেসক্রিপশন করুন যাতে প্রেসক্রিপশনে কোনো ভুল না থাকে। দুর্ভাগ্যের বিষয় সে সময় বৈদ্যুতিন মাধ্যমের যথাযথ প্রসারের অভাবে এই ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। কিন্তু সদ্য উদ্বোধন করা প্রধানমন্ত্রীর 'আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্রকল্প' সেই অভাব পূরণ করে দিতে চলেছে। আমরা যদি ডাক্তার, নার্স, পরীক্ষাগার কর্মীদের হাতে কাগজ-কলমের বদলে ডিজিটাল যন্ত্র তুলে দিতে পারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার ধুঁকতে থাকা অবস্থা ও মৃত্যুহার সবই নাটকীয়ভাবে কমে আসবে। এই সর্বাধুনিক প্রযুক্তির স্বাস্থ্যব্যবস্থায় চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার নাগরিকরা পাবে এবং তাদের খরচও অনেকটাই কমবে। ডাক্তার

হিসেবে জানি, রোগীর সঙ্গে থাকা সাম্প্রতিক তথ্যসমৃদ্ধ কয়েকটি কাগজ ও এক্সরে রিপোর্ট হাতিয়ার করে সঠিক রোগ নির্ণয় ও হঠাৎ জটিলতার কারণ অনুসন্ধান করা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া একজন ডাক্তারের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়।

অতীতের কোনো প্রেসক্রিপশান বা যথাযথভাবে নথিবদ্ধ নয় এর ভিত্তিতে চিকিৎসা করতে ডাক্তারের ওপর ভয়ংকর চাপ থাকে। সে জানে এর ফলে একজন মানুষের জীবন চলে যেতে পারে। অন্যসব কিছুর থেকে একজন রোগী সংক্রান্ত বিবিধ রিপোর্ট ও এক্সরে যদি উপযুক্ত ডাক্তারদের সহযোগিতায় নির্মিত ইএমআর-এ ঢোকানো যায় যে কোনো ডাক্তারই চিকিৎসা করায় নতুন উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস পাবে। চিকিৎসা করার কাজটা আনন্দের হতে পারবে।

এখন প্রশ্ন করতে পারেন যদি ইএমআর তৈরি করতে পারলেই রোগীর চিকিৎসায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে পারে তাহলে আমেরিকার হাসপাতালগুলিতে এত অঘটন ঘটছে কেন? উলটে এই ইএমআর-এর কারণেই অধিকাংশ মার্কিন ডাক্তার আজ হতাশা ও অবসাদে ভুগছে কেন? এর কারণ বহু বিলিয়ন ডলার খরচ করে তারা যে ইএমআর পদ্ধতি চালু করেছিল সেখানে এই ডাটা সংরক্ষণের সফ্টওয়ার হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়, রোগী সংক্রান্ত তথ্য সংযুক্ত করার বিষয়টি পরে তাদের মাথায় আসে তেমন রোগীর ডাটা গৌণ হয়ে গেছে ভারতের 'আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল হেলথ মিশন' চালু স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে যে সমস্ত নতুন স্বাস্থ্য স্টার্টআপ চালু হয়েছে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মেধা প্রসূত-প্রযুক্তি নিয়ে তারা সারা বিশ্বকে পরিষেবা দিতে পারবে। এর ফলে বিশ্ব বৈদ্যুতিন মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ভারত একটি প্রাধান্যের জায়গায় চলে যাবে।

প্রকল্পটি রূপায়ণের পথে একটু এগোলেই ইএমআর হয়ে উঠবে সর্বত্রগামী। এই অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিচয়পত্র থাকলে দেশের কোনো প্রান্তে কাঁড়ি কাঁড়ি কাগজ আর এক্সরেপ্লেট নিয়ে ছুটতে হবে না। ওই কার্ডের নম্বর আর ফোটো দেখেই ডাক্তারবাবুরা তাড়াতাড়ি বিনা কাগজপত্রে কেবলমাত্র কম্পিউটারেই রোগীর সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবেন। চিকিৎসাও পাবে সঠিক পথ নির্দেশ। বিশেষ করে ক্রনিক রোগীদের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা অসীম। অবশ্যই এর জন্য একটি অ্যান্ড্রয়েড গোত্রের ফোন থাকা জরুরি, ফোন থেকে তথ্য কম্পিউটারে ট্রান্সফার হবে। অতীতে রোগী যে সব ডাক্তার দেখিয়েছেন তাদের চিকিৎসাপত্র সবই একলপ্তে চিকিৎসক পেয়ে যাওয়ায় তাকে বারবার একই প্রশ্ন রোগীকে করতে হবে না। এর মধ্যে রোগীর পারিবারিক অসুখ সংক্রান্তও অন্তর্ভুক্ত হবে।

আর ডাক্তারবাবুর আগে থেকেই রোগীর খুঁটিনাটি জানা থাকায়— রোগীরা খোলা মনে বিনা ভয়ে কথাবার্তা বলতে পারবে। চিকিৎসা সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা মাথাব্যথা থেকে ক্যানসার অবধি সবই প্রাথমিকভাবে কিন্তু অনলাইনে শুরু হবে। সরাসরি অনলাইনে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলতে পারার ফলে (যাঁর কাছে রোগীর সব তথ্য আগেই রয়েছে) দীর্ঘসময় হাসপাতালে অপেক্ষা করার দরকার পড়বে না। রোগীরা রোগের প্রাথমিক অবস্থাতেই অনলাইনে ডাক্তারি পরামর্শ পেয়ে যাবে। অনিয়ন্ত্রিত ডায়বেটিসের ক্ষেত্রে অনলাইন ডায়াবেটিক টিমের মাধ্যমে নিয়ম করে চিকিৎসা অত্যন্ত ফলদায়ী। সব রকমের রক্ত পরীক্ষা, সিটি স্ক্যান, এমআরআই, আলট্রাসাউন্ড রিপোর্ট সবই অত্যাধুনিক ক্লাউড প্রযুক্তিতে যে কোনো জায়গার ডাক্তারবাবুরাই দেখতে পাবেন। রোগীকে ব্যয়বহুল একই পরীক্ষা বারবার করাতে হবে না। খুব শীঘ্রই ডাটা বিশ্লেষকের দল চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষার সাপোর্ট পদ্ধতি ইএমআর-এ সংযোজন করার ব্যবস্থা করবেন। সবকিছুই কম্পিউটারে থাকায় রোগী ভারচ্যুয়েলি অন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শও বাড়িতে বসে পেয়ে যাবে। হাতুড়ে ডাক্তারদের কিন্তু দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে। কেননা কেবলমাত্র সরকারিভাবে নথিভুক্ত ডাক্তাররাই অনলাইনে প্রেসক্রিপসান করতে পারবে।

ডিজিটালাইজেশান-এর সফল প্রয়োগ বিশ্বব্যাপী বহু অনাচারকে উন্মুক্ত করেছে। এখানে তথ্য নথিভুক্ত করতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে—(১) বিশ্বের সর্ববৃহৎ ট্যাক্সি কোম্পানি উবেরের নিজস্ব কোনো গাড়ি নেই, (২) ফেসবুক বিশ্বের সর্বাধিক প্রচারিত ডিজিটাল মিডিয়ার নিজস্ব কোনো কনটেন্ট নেই, (৩) আলিবাবা বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো খুচরো বিক্রেতার মালের কোনো স্টক নথিভুক্ত নয়। কোনো কিছু হাওয়ায় রেখে দেওয়ার দিন শেষ করতে আমাদের প্রযুক্তি প্রয়োগের দক্ষ সমর্থক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই নতুন হেল্থঅ্যাপ খুলে দিচ্ছেন যা ভারতেই সৃষ্টি করবে আমাদের প্রতিভাবান সফ্টওয়ার প্রযুক্তিবিদরা। সারা বিশ্ব এই নতুন ভারতীয় হেল্থঅ্যাপকে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। কারণ ভারতই হবে পথিকৃৎ।□

শোকসংবাদ

মালদা জেলার গাজোল থানার শিবাজীনগর গ্রামের রূপকার তথা প্রাণপুরুষ নরসিংহ প্রসাদ গুপ্ত গত ২ অক্টোবর কলকাতার একটি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি সঙ্ঘ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের মতো সংগঠনের বড়ো পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় শিবাজীনগরে একটি স্কুল স্থাপন করেন। প্রশাসনিক দপ্তরে তাঁর সুসম্পর্ক থাকায় সবাইকে আইনি পরামর্শ দিতেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি স্বস্তিকা পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন।

* * *

কলকাতার বিজয়গড় শাখার স্বয়ংসেবক সুধাংশু রায় গত ৩ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। বেশ কয়েক বছর প্রচারক থাকার পর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসজীবনে তাঁর নাম হয় দয়া প্রকাশ। ঝাড়খণ্ডের মধুবনীতে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

Government of Tripura
Office of the Executive Engineer
DWS Division, Ambassa
Jawharnagar, Dhalai Tripura

- অটল জলধারা মিশনের অন্তর্ভুক্ত গ্রামীণ এবং শহর এলাকায় বিনামূল্যে পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে।
- এই সুবিধা পাওয়ার জন্য পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের সাবডিভিশান অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের সাথে বা পঞ্চায়েতে যোগাযোগ করুন।

জলের কোনো বিকল্প নেই
জলই জীবন

জলের উৎসের চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন

● জল অপচয় করবেন না ● জলের সঠিক ব্যবহার করুন

বিজ্ঞানে আবেগ পুরাণে মায়া

নিখিল চিত্রকর

একই অঙ্গে বহু রূপ : শ্রীশ্রী চণ্ডীর দশম অধ্যায়ে মহাশক্তি মহামায়া যখন অসুররাজ শুম্ভকে বধ করছেন, তখন আহত শুম্ভাসুর মহাশক্তি মহামায়ার উদ্দেশে বলে, 'হে দুষ্ট দুর্গা! নিজ শক্তির অহংকারে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে তুমি এত গর্ব করো না। কারণ তুমি ছলে-বলে-কৌশলে অন্যান্য নারীশক্তির সাহায্য নিয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করছ। আর রণক্ষেত্রে তোমার বিরুদ্ধে আমি একা।'

প্রত্যুত্তরে দেবী বলেন—

'অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব।।

(শ্রীশ্রী চণ্ডী : দশম অধ্যায়, ৮)

অর্থাৎ এই জগতে আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কে আছে? চারদিকে যা কিছু দেখছো, সবই আমার বিভূতি। আমার থেকেই সব সৃষ্টি, আবার আমার মধ্যেই সব বিলীন হয়।

আসলে, শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করতে মহামায়ার শরীর থেকে ব্রহ্মাণী, যোগিনী-সহ বহু আদি শক্তির সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সব মাতৃশক্তিকেই যুগে যুগে মর্ত্যবাসী তাঁদের উপাস্য করে নিয়েছেন।

বহু নাম—অজস্র নাম :

নামের কোনও শেষ নেই। অযুত, নিযুত অগণিত নাম। কখনও কালী, কখনও দুর্গা, কখনও-বা ভগবতী। ভাষার সংস্কার ভেদে, অঞ্চল ভেদে শব্দের প্রয়োগে স্রষ্টার নাম পালটায়। তবে তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই। শিব-সদাশিব, কাল-মহাকাল, কালী-তারা-মহামায়া, বিষ্ণু আবার নারায়ণ— নামগুলি নিয়ে তর্কের শেষ নেই। কে ভগবান? কে কার আজ্ঞাবহ? মানুষ ধর্মভীরু। পুজো-আর্চা সবই করে। তবু কাকে সামনে রেখে জীবনের পথ সুগম করবে, তা জানতে চায় মনের অবসরে স্বপ্ন। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, অবচেতন মনের প্রতিফলনই স্বপ্ন। মনের গভীরে কিছু ভাবনা, কিছু ভয়-ভীতি, পরিকল্পনাই ঘুমের মধ্যে অবচেতন মন থেকে উঠে আসে বন্ধ চোখের পাতায়। তারপর বিচ্ছিন্ন স্মৃতির রোমন্থন। হাজারো নামেরও চরিত্রের জাবর কাটা।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, লক্ষ লক্ষ জন্মের স্মৃতি ধরা থাকে আমাদের মস্তিষ্কের স্মৃতিকোষ বা মেমরি সেল-এ। যে কারণে কখনও কখনও বহু অচেনা ব্যক্তিকে দেখে মনে হয় খুব পরিচিত। অচেনা জায়গায় গেলে মনে হয় আগে এসেছি। অদ্ভুত ভাবে মানুষের রক্তেও কিছু মেমরি সেল বা স্মৃতিকোষ থাকে। শরীরে একবার সর্দি-কাশি বা কোনও রোগ হলে সেরে ওঠার পর-পরই ওই রোগ-বিনষ্টকারী অ্যান্টিবডি রোগের জীবাণুর আচরণগুলোকে নথিবদ্ধ করে ফাইল আকারে সংগ্রহ করে রাখে। রোগ

চতুর্বেদ ও পুরাণের ছত্রে ছত্রে রয়েছে সৃষ্টির রহস্য। ভারত সনাতন ধর্মের প্রবক্তা। সনাতন পণ্ডিত ও মহর্ষিরা ছিলেন প্রচার বিমুখ। তাঁরা যুগের পর যুগ শুধু লিপিবদ্ধ করে গেছেন বিস্ময়কর গবেষণালব্ধ আবিষ্কার। যা দিয়ে সমৃদ্ধ আজকের বিজ্ঞান।

বাধলেই পরবর্তীকালে আপনা থেকেই নির্দিষ্ট রোগের অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যায় রক্তে। আমাদের দেহের এই ইমিউনিটি বা অনাক্রম্যতা আজকের নয়। বহু জন্মের যোগসূত্রতা রয়েছে তার সঙ্গে। প্রকৃতির পঞ্চতত্ত্বের সমন্বয়ে যে রক্তমাংসের মানবদেহ, তার বিনাশ আছে। কিন্তু মানবদেহের চালিকা শক্তি যে আত্মা তাঁর বিনাশ নেই। কারণ শক্তি যে ধ্রুবক।

অমরত্বের বালাই :

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্।
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো।
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।(গীতা—২ : ২০)

আত্মা কখনও জন্মান না বা মরেন না। আত্মার অস্তিত্ব উৎপত্তি সাপেক্ষ নয়, কারণ আত্মা জন্মরহিত। সে নিত্য, সনাতন ও চিরন্তন। শরীর বিনষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হন না। শক্তির নিত্যতা তত্ত্বের গূঢ় অর্থটাই মেঠো ভাষায় বুঝিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। বলেছিলেন, জামাকাপড় ছিঁড়ে গেলে যেমন আমরা বদলে ফেলি, তেমন শরীর জীর্ণ হলে আত্মাও তা বদলে ফেলে। এ আমরা সবাই জানি। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমোঘ পঙ্‌ক্তিও আমাদের অজানা নয়— 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?' তবু এই স্থূল দেহ, সম্পর্ক, বিষয়সম্পত্তি নিয়ে এত আসক্তি কেন? ওই যে বলছিলাম শত নাম— সহস্র নাম। সৃষ্টির স্রষ্টা যিনি, তিনিই মহামায়া।

মায়ার বাঁধন :

মায়া শব্দটির তাৎপর্য বড়ো মায়াময়। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, হতাশা-প্রত্যাশা— এই সব পজিটিভ-নেগেটিভ আবেগগুলো হলো মানুষের ডান মস্তিষ্কের সক্রিয়তা। এমনটাই বলে আধুনিক মস্তিষ্ক বিজ্ঞান। পুরাণ বলছে এই আবেগ বা ইমোশনের মূলে

ফঃ ২

রয়েছেন সেই মহাশক্তি যিনি মহামায়া রূপে সর্বব্যাপী ত্রিভুবনে। তাঁর মায়ায় আচ্ছন্ন স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব। মানুষ তো ছাড়!

মার্কণ্ডেয় পুরাণে মেধস ঋষি বলছেন—

মহামায়া হরেশ্চৈষা তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবি ভগবতী প্রযচ্ছতি।

তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম।।

(শ্রীশ্রী চণ্ডী : ১ : ৫৫-৪৬)

ভগবতী মহামায়ার প্রভাবে সকল জীবই মমতারূপ আবর্ত যুক্ত মোহের গর্তে পড়ে আছে। ভগবতী দেবী মহামায়া জ্ঞানীদের হৃদয়কে বলপূর্বক আকর্ষণ করে মোহাবৃত করে রাখেন। তিনিই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই প্রসন্না হলে মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য বরদান করেন।

সুতরাং এই যে আসক্তি, তা কিন্তু অবহেলার জিনিস নয়। অনেকটা অভিকর্ষ বলের মতোই তার প্রভাব। যে শক্তি বা বলের দরুন পৃথিবীর দুটি বস্তু পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ বা টান অনুভব করে তাকেই অভিকর্ষ বলে। এই অভিকর্ষ তত্ত্বকেই বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরে বিখ্যাত হলেন আইজ্যাক নিউটন।

এই যে খুব স্বাভাবিক ভাবেই এক মা অন্য কোনও শিশুকে স্তন পান করান। এই যে বন্ধুতা, প্রেম, কামনা-বাসনা, আবার কামনায় বাধা পেলেই ক্ষোভ-হতাশা, সবার মূলেই সেই এক মহামায়া। যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় অভিকর্ষ বল বলে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মেধস মুনির দুই শ্রোতা ভক্ত রাজা সুরথ ও সমাধি বণিক। রাজা সুরথ তাঁর সমস্ত রাজ্যপাট হারিয়েছেন। এমনকী সন্তানসম প্রজারাও তাঁকে পরিত্যাগ করেছে। প্রবন্ধিত রাজা গভীর জঙ্গলে মেধস মুনির আশ্রমে ঠাঁই নিলেন। সেই কুটিরেই রাজার সঙ্গে পরিচয় হয় সমাধিবৈশ্যের। যিনি কর্মসূত্রে বণিক। তাঁর স্ত্রী-পুত্রেরা সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ায় সমাধিও আশ্রয় নিয়েছিলেন মেধস ঋষির আশ্রমে।

তবু সমাধি বারবার চিন্তা করতেন তাঁর স্ত্রী-পুত্ররা কেমন আছে? কী করছে? ভালো আছে কি না? সেই উদ্বেগের কথা তিনি রাজা সুরথকেও বললেন। অবাক হলেন রাজা। তিনি নিজে না হয় তাঁর শত্রু, সভাসদ, মন্ত্রী পারিষদ দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। তাদের সঙ্গে আক্ষরিক অর্থেই সুরথের কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই। কিন্তু সমাধি! সে তো তাঁর নিজের স্ত্রী-পুত্রদের দ্বারাই বঞ্চিত হয়েছে! তবু তারা ভালো আছে কিনা সেই প্রশ্নে জর্জরিত হচ্ছেন বণিক! এ কেমন মায়া! এ প্রশ্নের উত্তর ছিল না বণিকের কাছে। অতএব মুশকিল আসান করতে পারেন একজনই। তিনি স্বয়ং মেধস ঋষি। দুজনেই ছুটলেন তাঁর কাছে। মহর্ষি মেধস বললেন, 'রাজন এই আসক্তি, এই আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনার সব কিছুই মহামায়ার প্রভাব। তিনি নিত্যা। তাঁর সৃষ্টি বা লয় নেই।

'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্ব মিদং ততম্।।'

(শ্রীশ্রী চণ্ডী : ১ : ৬৪-৬৫)

এই জগৎ, মহাবিশ্ব চরাচরই দেবী মহামায়ার অবয়ব। দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য যখন দেবী আবির্ভূতা হন তখন তিনি উৎপন্না নামে অভিহিতা। ভক্তদের মঙ্গলের জন্য যখন তাঁর সমাগম হয় তখন তিনি কালী। তিনিই চণ্ডী।

ইনি জগৎপতি শ্রীহরির যোগনিদ্রা। জগৎকে আচ্ছন্ন করে রাখেন বলে তাঁর নাম অবিদ্যা। আবার জ্ঞানীদের হৃদয় আকৃষ্ট করেন বলে তিনিই বিদ্যা।

বলা বাহুল্য যোগনিদ্রা, অবিদ্যা ও বিদ্যা— এই তিন বস্তুতত্ত্বের উপর নির্ভর করেই বিশ্বচরাচর আজ দৌড়চ্ছে। গ্রহরা ঘুরছে নির্দিষ্ট কক্ষপথে। সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, জোয়ার-ভাটা হচ্ছে নিয়মমাফিক। ইদানীং ফোরথ্ জেনারেশন ইন্টারনেটের যুগ চলছে। ফিফথ্ জেনারেশন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। বিজ্ঞান দৌড়চ্ছে দুর্নিবার গতিতে। তা সত্ত্বেও আজকের দিনের পশ্চিমি এমনকী মধ্যপ্রাচ্যের পণ্ডিতেরা আমাদের বেদ, পুরাণ নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। কেননা চতুর্বেদ ও পুরাণের ছত্রে ছত্রে রয়েছে সৃষ্টির রহস্য। ভারত সনাতন ধর্মের প্রবক্তা। সনাতন পণ্ডিত ও মহর্ষিরা ছিলেন প্রচার বিমুখ। তাঁরা যুগের পর যুগ শুধু লিপিবদ্ধ করে গেছেন বিস্ময়কর গবেষণালব্ধ আবিষ্কার। যা দিয়ে সমৃদ্ধ আজকের বিজ্ঞান। এমন কর্মকাণ্ড ভারতীয় হিসেবে আমাদের গর্বিত করবেই। কেননা গোটা বিশ্বের দরবারে ঘটে চলা সমস্ত কিছুর সঙ্গে অদৃশ্য যোগসূত্রতা রয়েছে ভারত নামের রাষ্ট্রটির। যেখানে রাষ্ট্রকে মা বলে অর্চনা করা হয়।

আজকের পৃথিবীর পরীক্ষাগারের যা প্র্যাকটিকাল ঘটে তাঁর ফর্মূলা দিয়েছেন ভারতের পুরাণ প্রণেতারা। আধুনিক মস্তিষ্ক বিজ্ঞান অনুযায়ী অনবরত ক্ষরণ হয়ে যাওয়া এনডর যিনি (ফিল গুড হরমোন) এবং কর্টিসল (ফিলব্যাড হরমোন)-এর খেলার রাশটি সেই মহামায়ার হাতেই।

বিসৃস্টৌ সৃষ্টি রূপা ত্বং।

স্থিতিরূপা চ পালনে।।

তথা সংহৃতি রূপান্তে।

জগতোঽস্য জগন্ময়ে।। (শ্রীশ্রী চণ্ডী : ১ :৭৬)

হে মহামায়া তোমার থেকেই এই জগতের সৃষ্টি। তোমার দ্বারাই জগতের পালন হয়। প্রলয়কালে তুমিই এর সংহার কর। সৃষ্টিকালে সৃষ্টিরূপা, পালনকালে স্থিতিরূপা ও প্রলয়কালে তুমিই শক্তিরূপা।

With Best Compliments from :

A Well Wisher

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনায় মা দুর্গাই রাষ্ট্রপ্রতিমা

ডাঃ নিত্যগোপাল চক্রবর্তী

'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'। প্রশ্ন হলো বীর কে? রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা প্রতিদিন প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করেন— 'সমুৎকর্ষ নিঃশ্রেয়সস্যৈকমুগ্রম্। পরং সাধনং নাম বীরব্রতম্।'

অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা মোক্ষ লাভের জন্য যে পরম সাধনা তারই নাম বীরব্রত। আর যারা এই বীর ব্রত পালন করেন তারাই বীর। স্বয়ংসেবকরা পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে বীরব্রত প্রার্থনা করেন। কারণ এই গুণের দ্বারা তারা ধর্মের সংরক্ষণের মাধ্যমে পরম বৈভবসম্পন্ন হিন্দুরাষ্ট্র পুনর্গঠন করার সামর্থ্য অর্জন করতে চান। পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবছেন ধান ভানতে শিবের গীত কেন? তাদের দুশ্চিন্তা দূরীকরণ নিমিত্ত এক্ষণে আমি সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণ নিচ্ছি। ধর্ম, দেশপ্রেম, আধ্যাত্মিকতা ও মোক্ষ— রাষ্ট্রীয়তার এই চার স্তম্ভ। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' তৎকালে দেশপ্রেমিকদের কাছে ছিল পবিত্র গ্রন্থ 'স্বরাজ গীতা'। 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে ঋষিবর দেশাত্মবোধকে আধ্যাত্মিক বোধে উন্নীত করেছেন। আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সন্তানদের কাছে দেশই হলো তাঁদের মা, দেশই তাঁদের উপাস্য দেবী মা দুর্গা। তাই ভবানন্দ সন্ন্যাসীর মুখে আমরা শুনতে পাই, 'আমরা দেশ ছাড়া অন্য মা মানি না— জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। জন্মভূমিই জননী; আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, তিনিই আমাদের দুর্গা, সর্বশক্তির আধার। তাই বলি তুমি যে হও, ভারতবাসী হইলেই মায়ের সন্তান, আমার ভাই; আর তুমি আমি সমগ্র ভারতবাসী একই জাতি।' বঙ্কিমচন্দ্র তাই দেশপ্রেমকে ধর্মে এবং ধর্মকে দেশপ্রেমে রূপান্তরিত করেছেন। দেশাত্মবোধই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম তা তিনি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। কমলাকান্তের দপ্তরে 'আমার দুর্গোৎসব' খণ্ডে সর্বপ্রথম তিনি জন্মভূমির মাতৃরূপ দর্শন করান।

আনন্দমঠের ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ ঠাকুর মহেন্দ্রকে মায়ের তিনটি মূর্তি দর্শন করান। এক, মা যা ছিলেন। দুই, মা যা হয়েছেন। তিন, মা যা হবেন। অর্থাৎ দেশমাতৃকার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ রূপ— জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গা। অতীতে ভারতমাতা শস্য-শ্যামলা, সম্পদশালিনী কলা, বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই তিনি ছিলেন জগদ্ধাত্রী— গৌরবোজ্জ্বল অতীত ভারতবর্ষের প্রতীক। তৎকালীন পরাধীন ভারত এবং বর্তমানের দুর্দশাগ্রস্ত ভারত হৃতসর্বস্বা, নগ্নিকা, রুধির সিক্তা, কঙ্কাল মালিনী মা কালী। ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ হলেন মা দুর্গা। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় সেই মা দুর্গার বর্ণনা— 'মহেন্দ্র দেখলেন এক মর্মর প্রস্তর নির্মিত প্রশস্ত মন্দির মধ্যে সুবর্ণ নির্মিতা দশভুজা প্রতিমা নবারুণ কিরণে জ্যোতির্ময়ী হয়ে হাসছেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাতে নানা আয়ুধ রূপে নানা শক্তি শোভিত। পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীর কেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণ ধারিণী, শত্রু বিমর্দিনী, বীরেন্দ্র পৃষ্ঠ বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্য রূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা বিজ্ঞান দায়িনী সরস্বতী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধি রূপী গণেশ।' বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় এটাই হলো ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের ছবি শক্তিরূপিণী দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গা। আর এই ছবি বাস্তবায়িত করার মানসেই স্বয়ংসেবকরা ধর্ম সংরক্ষণ পূর্বক পরম বৈভবশালী হিন্দুরাষ্ট্র পুনর্নির্মাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট বীরব্রত প্রার্থনা করেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এটাই রাষ্ট্রীয়তাবাদের মূল কথা। সুতরাং একথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মা দুর্গাই ভারতমাতা, ভারত-ভারতী। ও দেশসেবা, দেশাত্মবোধ, আধ্যাত্মিকতা, ভারত-আত্মা সমার্থক এবং সম সূত্রে গ্রথিত ঠিক যেমন রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, প্রণবানন্দ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ ভারত মনীষী তথা বাঙ্গলার বীর সন্তানদের চিন্তন-মনন-কথনের মূল সুর একই ঐক্যতানে ঝংকৃত, আর তা হলো— রাষ্ট্রসাধনা, মাতৃসাধনা, ধর্ম, দেশপ্রেম, আধ্যাত্ম সাধনা। প্রকৃতপক্ষে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ভারত আত্মার স্বপ্নকে সাকার রূপ প্রদানের জন্য রাষ্ট্র সাধনা করে চলেছেন।

> **"ভারতের গৌরবময় উজ্জ্বল অতীত ইতিহাসের ধারক ও বাহক হয়ে যদি আমরা দেশকে আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে চাই, তবে ভারত মনীষীদের অনুসৃত পথে শক্তিপূজা অর্থাৎ ভারত ভবানীর পূজা (নিঃস্বার্থ দেশ সেবা)-র মাধ্যমে রাষ্ট্রবোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতেই হবে।"**

পরাধীন ভারতকে শৃঙ্খলা মুক্তির সংগ্রামে আত্মনিবেদিত বিপ্লবীরা স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে স্বদেশী আন্দোলনের সেই যুগে ভারতমাতার মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বিপ্লবীদের যে কোনো কেন্দ্রে তল্লাশির সময়ে স্বামীজীর লেখা কোনো না কোনো বই পাওয়া যেত। বিপ্লবীদের শিয়রে টাঙানো থাকতো, 'সাইক্লোনিক হিন্দু মংক'-এর ছবি আর সেখানে লেখা থাকতো 'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ বিরোধত।' ভারতবাসীর উদ্দেশে তিনি বলতেন— 'বীরের মতো এগিয়ে যাও, সিদ্ধিলাভ আমরা করবই। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের সহায়।' স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম ও কর্মের দ্বারা এমন এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যারা দেশমাতার শৃঙ্খল মোচনে প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকবেন। তাইতো তিনি বলেছিলেন, 'তুমি

জন্ম থেকেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত'। প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা আনন্দমঠের সন্ন্যাসী ভবানন্দের প্রতিমূর্তি দেখতে পাই। ভবানন্দের সুরে সুর মিলিয়ে তিনি বলেছেন, 'অন্য সব দেবতাকে ভুলে আগামী ৫০ বছর ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্যা দেবী হউক।' তৎকালীন মুক্তি আন্দোলনের নেতারাও স্বামীজীর কাছে যাতায়াত করতেন। কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে দলে দলে তারা শ্রীমা সারদা দেবীকে প্রণাম করতে আসতেন। শ্রীমা বলেছেন, 'সকলেই বলছে তারা স্বামীজীর শিষ্য'। তার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের দেওয়া মন্ত্র 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা'র আদর্শ রূপায়িত করবার জন্য তিনি সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সূচনা করেন। রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীদের একমাত্র ব্রত মানুষের সেবা যা আজও প্রবহমান। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল একথা ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্টে পাওয়া যায়। স্বামীজীর লেখা 'বর্তমান ভারত' রচনাতে সমাজ, দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা আমরা দেখতে পাই। স্বামীজী দেশ বলতে দেশের মানুষকে বুঝতেন। ভারতবর্ষের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত কন্যাকুমারীর শিলাখণ্ডের উপবেশন করে তিনদিন ধরে স্বামীজী মা ভগবতীর অখণ্ড সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। মা ভগবতী অর্থাৎ মা দুর্গা। ভারতমাতার মানচিত্র উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব থেকে পশ্চিম তার ধ্যাননেত্রে চিত্রপটের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তাঁর মানস চোখে ধরা দিল 'নতুন ভারত।' অর্থাৎ স্বামীজীর ভাবনাতেও সেই মা দুর্গাই ভারতমাতা, স্বদেশ মাতা, ভারত ভূমি। স্বয়ংসেবকদের কাছে, স্বামী বিবেকানন্দ আদর্শ পুরুষ।

আর একজন মহাপুরুষ যাকে অগ্নিপুরুষ, শক্তি পুরুষ, সিদ্ধপুরুষ বা আধ্যাত্ম পুরুষ, কোনো বিশেষণেই পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা যায় না— তিনি ঋষি অরবিন্দ। পূর্বাশ্রমে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন ভারত আত্মার মুক্তির জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলেন। আইসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সরকারি চাকরি প্রত্যাখ্যান করে তিনি বরোদা কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন বিপ্লবের কাজ শুরু করেন। এই বরদাতেই ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁরই সহায়তায় কলকাতাতে গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। পরে ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রর অনুশীলন সমিতির সহ-সভাপতি হন। ভারতমাতাকে শৃঙ্খলমুক্ত করার কাজকে তিনি ঐশ্বরিক কাজ বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রামের জন্য চাই দেশপ্রেম, আত্মবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়। বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন তিনি ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার কথা বলেন। ফলে ইংরেজ সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে। মৃন্ময়ী মাতৃভূমিকে তিনি চিন্ময়ী রূপে দেখতেন। তার কাছে দেশমাতাই ছিল দেবী দুর্গা। রাষ্ট্র সাধনাকে তিনি শক্তিপূজা, দেশমাতৃকার পূজা মনে করতেন। সত্যি বলতে কী, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসের কল্পিতচরিত্র সন্ন্যাসী নেতা, সন্তানদলের পুরোধা,মঠাধিপতি, দেশভক্ত সত্যানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবন বেদের বাস্তব রূপ আমরা অরবিন্দের জীবনীতে প্রকটভাবে দেখতে পাই। যাঁরা শ্রীঅরবিন্দের সেই ছোট্ট পুস্তিকা 'ভবানী মন্দির' পাঠ করেছেন তাঁরা সবাই এ বিষয়ে অবগত আছেন। স্বদেশপ্রেম কোন উচ্চতায় পৌঁছলে তা অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে পারে তা এই ছোট্ট পুস্তিকা না পড়লে বোঝা যাবে না। এই পুস্তিকাটিতে তিনি একটি মন্দির নির্মাণের কথা বলেছেন, যে মন্দিরের দেবী হবেন দেশজননী মাতৃরূপা ভবানী ভারতী। ভবানী হলেন মা ভারতমাতা যিনি প্রেম, জ্ঞান, ত্যাগ ও দয়ার প্রতিমূর্তি। নিজের সমগ্র সত্তার মধ্যে দেশমাতা মাতৃরূপা দেবী দুর্গা মিলেমিশে একাকার। শুধুমাত্র এই বোধ জন্মালেই কেউ দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে ক্ষুদিরামের মতো নির্ভীক কণ্ঠে বলতে পারে, 'আমি অক্ষয়, আমি অব্যয়, আমাকে মারে কার সাধ্য'। আলিপুর বোমা মামলায় ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়, সেই একই মামলায় ক্ষুদিরাম, অরবিন্দ-সহ ৩৬ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এক বছরের বেশি বন্দিদশা কাটানোর সময় অরবিন্দ মহাজাগতিক চৈতন্য প্রভায় প্রভাবিত হন। তিনি ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে লিখতে থাকেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রখর যুক্তিবাদী সওয়ালের ফলে অরবিন্দ-সহ সতেরো জন বিপ্লবী মুক্তি লাভ করেন। বিপ্লবের তীর্থভূমি বাঙ্গলায় তার শেষ আশ্রয় উত্তরপাড়া। সেখান থেকে তিনি উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিকতা ও দেশপ্রেম সংবলিত ভাষণ দেন যা 'উত্তরপাড়া অভিভাষণ' নামে বিখ্যাত। তারপরই তিনি পণ্ডিচেরী চলে যান এবং অখণ্ড আধ্যাত্মিক সাধনায় মনেনিবেশ করেন। অরবিন্দ ঘোষ হয়ে ওঠেন মহাঋষি শ্রীঅরবিন্দ। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্য 'সাবিত্রী' শেষ করেন। তাঁর কাব্যের নায়িকা সাবিত্রী হলেন বিশ্ব জননী, বিশ্বমাতা, দেশমাতা দেবী দুর্গা।'ভবানী ভারতী' সংস্কৃত কাব্যে ভারতমাতাকে তিনি সর্বপ্রথম কালী রূপে ও তারপর বিভিন্ন রূপে যথা— সনাতনী দশভুজা দুর্গা, অন্নপূর্ণা, রাধা, ভবানী, মহেশ্বরী এবং ভারত ভারতী রূপে প্রকাশ করেছেন। 'ভবানী মন্দির'-এর জীবন্ত বিগ্রহ মা ভবানী ঘোষণা করছেন, 'আমিই বিশ্ব জননী, জগজ্জননী, আর তোমরা যারা এই পবিত্র আর্যভূমির সন্তান, যারা তার মাটিতে জন্ম নিয়ে তার আলো-বাতাসে প্রতিপালিত হচ্ছো, তাদের কাছে আমি ভবানী ভারতী ভারতমাতা।' পণ্ডিচেরিতে যাঁরা শ্রীঅরবিন্দের সাধনকক্ষ দর্শন করেছেন তারা জানেন, সেখানে যে বিগ্রহ সামনে রেখে তিনি ধ্যানমগ্ন হতেন তা হলো অখণ্ড ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপর ভারতমাতার একখানি চিত্রপট।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য— এ কথা সবাই জানেন। ঋষি অরবিন্দের সুযোগ্য উত্তরসূরি, তাই সশস্ত্র সংগ্রামের নায়ক। মতবিরোধের কারণে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েও তা প্রত্যাখ্যান করে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য ছদ্মবেশে বিদেশযাত্রা ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। ইংরেজের বাধা ও রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে সুভাষচন্দ্র 'ভারতমাতা'র বিগ্রহ গড়ে পূজা করেছিলেন, একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র--- সমস্ত ভারত মনীষীদের চিন্তা-চেতনায় যে একই সুর ঝংকৃত তা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। পরিশেষে এ কথাই বলা যায় যে, রাষ্ট্রবোধই আমাদের জিয়নকাঠি। ভারতের গৌরবময় উজ্জ্বল অতীত ইতিহাসের ধারক ও বাহক হয়ে যদি আমরা দেশকে আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে চাই, তবে ভারত মনীষীদের অনুসৃত পথে শক্তিপূজা অর্থাৎ ভারত ভবানীর পূজা (নিঃস্বার্থ দেশ সেবা)-র মাধ্যমে রাষ্ট্রবোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতেই হবে। □

একবার গণেশের ভুড়িতে আঙুল ঢুকিয়ে দেখেছিলাম কতটা যায়

বিজয় আঢ্য

ছেলেবেলাটা কেটেছে কলকাতায়। উত্তর কলকাতার দর্জিপাড়ায়। দর্জিপাড়াকে কেন্দ্র করে এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধ। স্বামীজীর ভাষায় 'শৈশবের শিশুশয্যা।' ছেলেবেলার পুজো কেটেছে এখানেই। যে সময়ের কথা বলছি তখন 'চাপাকল' থেকে জল নিয়ে রাস্তা ধোওয়া হতো। সন্ধ্যের সময় মই ঘাড়ে করে নিয়ে এসে রাস্তায় গ্যাসের লাইট জ্বালিয়ে দিয়ে যেত। বিকেলে টিনের বাক্স পিঠে ঝুলিয়ে ফেরিওয়ালা আলুরদম, ঘুগনি বিক্রি করত। আমাদের দু'ভাইকে লোকে 'জগাই-মাধাই' বললেও ঠাকুমার ন্যাওটা একটু বেশি ছিলাম। তাই ঠাকুমার গঙ্গাস্নানের সঙ্গী আমিই। কাছের কাশী মিত্তির ঘাট যেতে হলে নতুন রাস্তা (সেন্ট্রাল এভিনিউ) পেরিয়ে শোভাবাজার হয়ে কুমোরটুলির ভেতর দিয়ে যেতে হতো এবং তা হেঁটেই। আর এই কুমোরটুলির ভেতর প্রায় শ'খানেক দোকানে মাটির প্রলেপ দেওয়া দুগ্গা ঠাকুর সব সারি সারি দাঁড়িয়ে। মুণ্ড নেই। মুণ্ড সব একটা পাটাতনের ওপর শুকোচ্ছে। তবে দুগ্গা মা-র ছেলে-মেয়েরা সব একই রকম— কারোর গায়ে কোনও রং নেই। একবার গণেশের ভুড়িতে আঙুল ঢুকিয়ে দেখছিলাম সেটা কত দূর গেছে। মহালয়ার সময় যখন যেতাম তখন অন্যচিত্র। সব ঝলমল করছে। মা দুগ্গার টানা টানা চোখ, নাকে নথ, গায়ে কত গহনা, সিংহের ঝাঁকড়া কেশর আর জ্বলজ্বল করছে চোখ, হাতে ইয়া বড়ো এক খাঁড়া নিয়ে আক্রমণে উদ্যত অসুর, বিরাট একটা মোটা সাপ তাকে পেঁচিয়ে থাকলেও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে মরা মোষ, মা'র চারপাশে তার ছেলে-মেয়েরা সব সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে। মামার বাড়ি যাবে বলে কথা! হাঁ করে সব দেখতাম। প্রথম প্রতিমা দর্শন! ঠাকুমা ঠেলা দিত— চ্ চ্।

সে সময় মহালয়ার দিন ভোর চারটেয় রেডিয়োতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ' শোনার পর থেকেই পুজো শুরু হয়ে যেত। পাড়ার মোড়ে নতুন রাস্তার ধারে পুজোর ম্যারাপ বাধা দেখতে যাওয়া হয়ে উঠত একটা রুটিন। বাবার সঙ্গে ভাই-বোনেরা মিলে শোভাবাজারের ট্রাম লাইনের বাঁকের মুখে নলিনী সরকারের দোকানে জামা-প্যান্ট কিনতে যাওয়া। এরপর শুরু হতো ঠাকুর দেখতে যাওয়া আর তা সপ্তমীর দিন থেকে। এখন যেমন কলকাতায় তৃতীয়া-চতুর্থী থেকেই পুজো শুরু হয়ে যায়, নানা মণ্ডপে পুজোর উদ্বোধন হয়, প্রতিমা, মণ্ডপ, আলোর প্রতিযোগিতা হয়, তখন তেমন ছিল না। বেশিরভাগ মণ্ডপ বা প্রতিমা একই রকমের। মোটামুটি পঞ্চমীতেই প্রতিমা আসতো। মণ্ডপগুলোর সজ্জায় শেষ তুলির টান পড়তো। আর ষষ্ঠীর সকালে ঢাকে পড়তো কাঠি।

ঠাকুর দেখতে বেরোতাম দুপুরেই। কেননা সন্ধ্যের মধ্যেই বাড়ি ফিরতে হবে। ফায়ার ব্রিগেডের দিকে গেলে পথে গিরিশ পার্ক, সিমলা ব্যায়াম সমিতি, চোরবাগান, আর বাগবাজারের দিকে গেলে শোভাবাজার, আহিরিটোলা, কুমোর্টুলি, বাগবাজার, শোভাবাজারের রাজবাড়ি হয়ে ফেরা। আর বড়ো কেউ নিয়ে গেলে শিয়ালদার দিকে ঠাকুর দেখতে যেতাম। পুজোয় ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে আমাদের খাওয়া বা সখের দৌড় ছিল মাংসের ঘুগনি, ভেজিটেবিল চপ, কচুরি, জিলিপি, ফুচকা আর নাগরদোলায় চাপা লটারি, বিশেষ করে সোনপাপড়ির লটারি পর্যন্ত। একবার কাঁটাটা একশোতে গিয়ে থামতে একশোটা সোনপাপড়ি পেয়েছিলাম। দিয়ে-থুয়ে খেয়েও কটা রয়ে গেছিল। সে কী আনন্দ! সে সময় বড়োদের কাছ থেকে পুজোর পার্বণী যেটা পেতাম, সেটাই ছিল হাতখরচ। একবার সপ্তমী কী অষ্টমীর দিন শাখার মুখ্যশিক্ষক বাচ্চুদা আমাদের দাসনগরে ঠাকুর দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন দাসনগরে ছোটো ট্রেন চলতো। ট্রেনে করে ঠাকুর দেখতে যাওয়া— আনন্দের সঙ্গে বিস্ময়ের সে এক অনাস্বাদিত অনুভূতি।

দশমীর দিন ঠাকুর বিসর্জন হয়ে গেলে আমরা ভাই-বোনেরা লাল কালি দিয়ে তিনবার লিখতাম— শ্রীশ্রী দুর্গামাতা সহায়। এরপর গুরুজনদের প্রণাম করে পাড়ার প্রতিবেশীদের বাড়িতে প্রণাম করতে যেতাম। সব থেকে মজা লাগতো বাবা-কাকারা যখন কোলাকুলি করতো। লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত চলতো মামার বাড়ি, পিসির বাড়ির মতো আত্মীয়দের বাড়িতে যাওয়া। লক্ষ্মীপুজো হয়ে গেল মানে দুগ্গাপুজো শেষ, বড়োরা বলতেন, এবার পড়তে বোসো। কেননা স্কুল খুললেই ক্লাসে ওঠাওঠির পরীক্ষা। তবে কালীপুজো না যাওয়া পর্যন্ত পুজো-পুজো ভাবটা থেকেই যেত। আমাদের পাড়ার অগ্নিশিখা ক্লাবে কালীপুজোতে জলসা, জিমনাস্টিক, রাস্তায় পর্দা টাঙিয়ে সিনেমা হতো। গায়ে তেল মেখে পাড়ার রঞ্জুদার মতো কয়েকজন লোক হাত-পা-র মাসল ফুলিয়ে দেখাতো। লোহার ভারী ভারী চাকা আকাশের দিকে তুলে ধরে দেখাতো। সবাই খুব হাততালি দিত। আর একটা কথা। বিসর্জনের পরেই দরিদ্রনারায়ণ সেবা হতো। রাস্তায় পাতা পেড়ে খিচুড়ি খাওয়ানো হতো। ▯

সার্বজনীন দুর্গোৎসব এবং তারপর.....

কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মা দুর্গার প্রতিমা বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয় বাঙ্গালির সর্ববৃহৎ উৎসব শারদীয়া দুর্গা পূজা। কয়েকদিনের উৎসবে আমোদপ্রিয় বাঙ্গালি চক্ষু, কর্ণ ও স্বাদ-আঘ্রাণের যাবতীয় তৃপ্তি চেটেপুটে উপভোগ করে মহা সন্তোষ অনুভব করে। তারপর কিছুদিনের শূন্যতা। এরপর শুরু দীপাবলী বা কালীপূজার প্রস্তুতি। তারপর জগদ্ধাত্রী...। কিন্তু, মা দুর্গার আরাধনার যে তাৎপর্য অর্থাৎ অসুর শক্তির বিরুদ্ধে শুভশক্তির জয়লাভ এবং সমাজের বুকে মঙ্গল ও কল্যাণকারী শক্তির প্রতিষ্ঠালাভ, এই বিষয়গুলি ক্রমশই গুরুত্বহীন হয়ে পড়তে চলেছে, যা অতীব দুর্ভাগ্যজনক।

সর্বপ্রথম যেটা উল্লেখ করার প্রয়োজন তাহলো এই উৎসবের কদিন যে প্রচার তাতে পরিবেশ-দূষণের মাত্রা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে, যারা ভুক্তভোগী তাদের তা আর বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না।

দুর্গাপুজোর আরতির সময় শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর ও ঢাকের আওয়াজ পুজোর পরিবেশকে মনোরম করে তোলে। এই ধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়কে যন্ত্রণা দেয় না বরং তা মনের মধ্যে পবিত্রভাব জাগিয়ে তোলে।

কিন্তু শহর-নগরের অলিতে-গলিতে যেসব ছোটো ও মাঝারি দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয় তাদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য অংশ শব্দব্রহ্মের অপপ্রয়োগে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। সারা দুপুরবেলা ধরে এবং অনেক রাত অবধি ডিজে অথবা লাউডস্পিকার নিঃসৃত তীব্র শব্দে সাধারণ মানুষের হৃৎকম্প সৃষ্টি হয়। বৃদ্ধ, অতি-বৃদ্ধ, শিশু এবং হৃদরোগীদের কথা না হয় বাদ দিলাম। পুলিশ-প্রশাসন এই বিষয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করাকেই শ্রেয় বলে মনে করে। পুলিশ-প্রশাসন এবং দূষণ-নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কি উচিত ছিল না এই মহোৎসবের বহু পূর্বেই বিভিন্ন গণ-মাধ্যমে প্রচার করে এইসব ক্লাব বা পুজো- উদ্যোক্তাদের শিক্ষিত করে তোলা বা দূষণজনিত নিয়ম ভঙ্গ করলে আইন-মোতাবেক তাদের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা? পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত এবং সভ্যদেশে এইসব জিনিস সে দেশের প্রশাসন

বরদাস্ত করে না। আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে এইসব ক্ষতিকর ও দূষণসৃষ্টিকারী কাণ্ডকারখানা অবাধে চলতে থাকে। অনেক ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক হন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ওজনদার নেতারা। আরও স্পষ্ট করে বললে বলা উচিত শাসক দলের নেতাদের আধিক্যই বেশি দেখতে পাওয়া যায় এইসব ক্ষেত্রে। তাই সাধারণ মানুষ ভয়ে বা অন্যকোনো কারণে সবরকম অন্যায়-অত্যাচার মুখ বুজে মেনে নিতে বাধ্য হন।

বর্তমানে একটা শব্দবন্ধ খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তা হলো 'থিম পুজো'। বিভিন্ন ক্লাব ও পুজো-উদ্যোক্তারা বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে পুজোমণ্ডপ নির্মাণ করে থাকেন। প্যান্ডেলের কারুকার্য ও আলোর বাহারে কে কাকে টেক্কা দিতে পারে তার একটা প্রতিযোগিতা চলে। কলকাতার পুজো-প্যান্ডেলগুলিতে রংবাহারি আলোর বন্যা দেখতে দূরদুরান্ত থেকে দলে দলে মানুষজন এসে হাজির হন। সম্প্রতি, বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে এইসব বাহারি আলোর রশ্মিছটা মানবদেহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই, এই বিষয়ে আরও ব্যাপক সমীক্ষা ও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। তৎসহ, সাধারণ মানুষকে এই ব্যাপারে অবহিত করা দরকার।

এরপর আসে বিসর্জন পর্ব। এটিও এক বিরাট অনুষ্ঠান বলা যায়। অসংখ্য পূজা-উদ্যোক্তা অসংখ্য প্রতিমা নিয়ে গঙ্গা-সহ বিভিন্ন নদী ও জলাশয়ের ধারে গিয়ে হাজির হন প্রতিমা বিসর্জনের উদ্দেশ্যে। অনেক রাত পর্যন্ত চলে এই পর্ব। এইরূপ বিসর্জনের ফলে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলি-সহ অন্যান্য জলাশয়গুলি ভীষণ রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পরিবেশগত ভারসাম্য চূড়ান্তভাবে বিঘ্নিত হয়ে পড়ছে। একথা আজ বিভিন্ন গণমাধ্যমে আলোচনার ফলে অনেকেই তা অবগত আছেন। ১৯৯৩-৯৫ সালের কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের এক হিসেবে জানতে পারা যায় যে বছরে অন্তত ১৫০০০ দুর্গা প্রতিমা হুগলী নদীতে বিসর্জিত হয়। এর ফলে ১৬.৮ টন বার্নিশ ও তেল আর ৩২ টন রাসায়নিক জলে মেশে। এইসব রঙের মধ্যে রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ, সীসা, পারদ, ক্রোমিয়ামের মতো ক্ষতিকারক পদার্থ। এছাড়াও সমীক্ষা আরও বলছে যে দুর্গাপুজো ও দশেরার সময় জলে তেল ও গ্রিজের পরিমাণ লিটার প্রতি ০.৯৯ মিলিগ্রাম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (তথ্যসূত্র : টাইমস্ অব ইন্ডিয়া, ২৬ অক্টোবর, ২০১৫)। এই হিসেব ১৯৯৩-৯৫ সালের। এই ক'বছরের ব্যবধানে হুগলী নদীর মধ্য দিয়ে অনেক জল প্রবাহিত হয়েছে। দূষণের মাত্রাও যে কয়েকগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই তা আশঙ্কা করা যায়। এরফলে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ ভয়ংকর রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে, যার প্রভাব পড়ছে পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে। ভারতীয় সভ্যতার প্রাণপ্রবাহ গঙ্গানদী। এই নদী যদি মৃতপ্রায় অবস্থায় উপনীত হয় তাহলে সমগ্র ভারতীয় সভ্যতা ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুখের কথা যে বিভিন্ন মহলে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং একটা জিনিস পরিষ্কার হয়েছে যে অন্তত কিছুসংখ্যক মানুষ এ বিষয়ে আন্দোলিত হচ্ছেন। কিন্তু তা যে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয় তা বলাবাহুল্য। আইন-আদালত এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে আপামর জনগণ যদি এই বিষয়ে সচেতন ও সজাগ না হন তাহলে বিপদ থেকে বাঁচবার কোনো উপায় থাকে না। ■

পুজোর দিনগুলিতে ভলেন্টেয়ারি করে সব থেকে বেশি মজা পেতাম

রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপনারায়ণ ও আর একটা ছোটো নদীর পাশে ছোট্ট একটি গ্রাম। সেই গ্রামের পুজোর আনন্দই আলাদা। শুধু পুজোর চার-পাঁচটা দিন নয়, অনেকগুলো দিন ধরেই তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা। প্রতিমা তৈরির পুরো পর্বটাই তো দিব্য ঘটতো চোখের সামনে। প্রথমে কাঠামো, তারপর খড় বাঁধা, মাটি চাপানো, একমেটে, দোমেটে, তেমেটে, প্রথমে রঙের আস্তর, তারপর আসল রঙ, চোখ-মুখ আঁকা, কাপড় পরানো— একটু একটু করে মা রূপ পান, চোখে পড়ে আসা-যাওয়ার পথে। প্রতিমা শিল্পী, পুরোহিত, ঢাকি সবাই তো বংশপরম্পরায় ঘর-বাঁধা।

পুজোর পর বিসর্জনের আকর্ষণও বড়ো কম ছিল না। প্রতিমাকে নৌকোয় তুলে ছোটো নদীতে খানিকক্ষণ ঘোরানো, তারপর মাঝনদীতে বিসর্জন। একসঙ্গে অনেকগুলো প্রতিমা। পরিবেশ দূষণের দোহাই দিয়ে গ্রামেগঞ্জে তা বন্ধ হয়েছে কি না খবর রাখিনি।

গ্রামের পুজো দেখার সৌভাগ্য অবশ্য আমার বেশি দিন হয়নি। গ্রামের স্কুলের মাস্টারি ছেড়ে কলকাতায় বাবা বিদেশি সওদাগরি অফিসে চাকরি নিয়েছিলেন অনেকদিন। হাওড়ার শিবপুরে ছোটো একটি বাড়ি করে নিয়ে এলেন আমাদের। শৈশব তখনও কাটেনি, গ্রামে সুধীর মাস্টারের পাঠশালা ছেড়ে শহরের স্কুলে সোজা ক্লাস ফাইভে ভর্তি। শিবপুরের এই অঞ্চলটা দক্ষিণপাড়া। সেখানে বারোয়ারি পুজো হতো একটাই আর বাড়ির পুজো দু'তিনটে। সকলের ভিড় ছিল দক্ষিণপাড়ার পূজামণ্ডপেই। আমাদের মতো ছোটোদের সবচেয়ে মজা লাগত সন্ধ্যেবেলা ভলেন্টিয়ারি করতে। দড়ি দিয়ে পুরুষ-মহিলাদের যাতায়াতের আলাদা পথ, বেপথুদের অনুরোধ-উপরোধেও কাজ না হলে হাত ধরে টানাটানি। ছোটো বলে পাত্তা দিত না অনেকে, খুব খারাপ লাগত। তবু দিনের শেষে এই সময়টার জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা।

দক্ষিণপাড়াতেই ছিল কুঁতিবাড়ির পুজো। বিশেষ কারণে মনে আছে এই পুজোটার কথা। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দুর্গাদাস কুঁতির বাড়িতে সকালবেলা ঠাকুর দেখতে গেলে ছোটোদের মিলত এক বাটি খই মুড়কি বাতাসা আর নারকেল নাড়ু বা দরবেশ। এখনও কুঁতিবাড়ির পুজো হয়, তবে অন্য জায়গায় নতুন বাড়িতে। বিদ্যাসাগর সেতুর সংযোগকারী উড়ালপথের জন্য পুরনো ভদ্রাসনটি সরকার অধিগ্রহণ করে। কিন্তু বাড়ির পুরো জায়গাটা কাজে লাগেনি, ভাঙা পড়ে একাংশ। বাকি বাড়িটা, যেখানে ঠাকুরদালানটাও ছিল, ফেরত পাওয়ার জন্য মামলা করে কুঁতিরা। দীর্ঘকাল লড়াইয়ের পর বাড়তি কিছু ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে হয় সে দাবি। সেই জায়গাতেই এখন গড়ে উঠেছে 'নবান্ন'-র লাগোয়া 'উপান্ন', নামকরণ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীরই।

দক্ষিণপাড়ারই চাটুজ্জে বাড়িতেও দুর্গা পুজো হতো। এবাড়িরই ছেলে সূর্য চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বাংলা সিনেমার নামকরা শিল্পনির্দেশক। অনেক ছবিতে অভিনয়ও করেছেন। ঋতুপূর্ণ ঘোষের জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত 'বাড়িওয়ালি' ছবিতে দুর্দান্ত অভিনয়ের জন্য প্রশংসিত হয়েছিলেন। সূর্যের দাদা ছিলেন চন্দ্র। বিদ্যাসাগর সেতুর কল্যাণে সেই চাটুজ্জে বাড়িরও একাংশ ভাঙা পড়েছে। পুজোও স্থানান্তরিত কলকাতায় এক শরিকের বাড়িতে। 'চাটনি-চুণি' বলে পরিচিত অপর এক চাটুজ্জে বাড়ি আর বাড়ির পুজো সবই সেতুর গ্রাসে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন। দ্বিতীয় হুগলি সেতুর জন্য দক্ষিণপাড়ার বিস্তৃত-এলাকায় কয়েকশো ছোটো-বড়ো বাড়ি যেমন সাফ হয়ে গেছে, বাসিন্দাদের চলে যেতে হয়েছে অনেক দূরে সরকারি পুনর্বাসন আস্তানায়, তেমনি বাকি জায়গায় নতুন জনবসতিও গড়ে উঠেছে, তাল মিলিয়ে বেড়েছে সর্বজনীন পুজোর সংখ্যাও। বহুদিন পর্যন্ত শিবপুরের এ তল্লাটে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছিল দক্ষিণপাড়ার পুজোর একচ্ছত্র এক্তিয়ার। তাতে প্রথম ভাগ বসাল চার-পাঁচশো মিটার দূরের মনসাতলা। বহুকাল ধরে পূজিত একটি মনসা গাছকে ঘিরে চাতাল, তার চত্বরেই শুরু হলো দুর্গাপুজো। মনসাতলার অনতিদূরেই পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল হিন্দুদের বসতি কল্যাণপল্লি। তাঁরাও পুজো শুরু করলেন পরের বছরেই। কল্যাণপল্লির পাশেই 'চাষির মাঠ', এই সেদিন পর্যন্ত সেখানে শাকসবজির চাষ হতো। ও পাড়ায় খেলাধুলো সেরে বাড়ি ফেরার পথে কতদিন 'কালা চাষি' জেঠুর কাছ থেকে কপিটা-মুলোটা চেয়ে এনেছি। চাষবাস উঠে গিয়ে একসময় সেখানেই মাথা তুলল সারি রারি আবাস। চালু হয়ে গেল আর একটা দুর্গাপুজো। কালা চাষির সগোত্ররা, উত্তরপুরুষরা

এখন পাইকারি বাজার থেকে শাকসবজি কিনে ট্রলি নিয়ে দরজায় দরজায় বিক্রি করেন বা স্থানীয় বাজারে বসেন।

ইতিহাস বলে, সুদূর অতীতে গঙ্গা এ-অঞ্চলের অনেক কাছ দিয়ে বয়ে যেত। ধারে ছিল বেতবন। তারই মাঝে অধিষ্ঠান ছিল মা চণ্ডীর। বণিকরা তাঁকে পুজো দিয়েই কাছের বেতড্ড বা বেতড় বন্দর থেকে বাণিজ্য তরী ভাসাত। বেতবনের চণ্ডী বলে নাম বেত্রচণ্ডীকা বা বেতাইচণ্ডী। আর তার থেকেই পল্লির নাম বেতাইতলা বা ব্যাতাইতলা। বলতে গেলে দক্ষিণপাড়া, মনসাতলা, সানাপাড়া, ভড়পাড়া, শালিমার ইত্যাদি সবই বেতাই মায়ের তালুক। সব জায়গাতেই পুজো হয়, যেমন সানাপাড়ায় (একসময় ব্রিটিশ সেনা ছাউনি ছিল বলে এমন নাম) বনেদি বাড়ির পুজো অনেককাল রূপান্তরিত হয়েছে বারোয়ারিতে, তার পাশেই ভড়পাড়ায় চারমন্দিরে, আন্দুলরাজের চার প্রাচীন শিবমন্দির পরিসরে সর্বজনীন পুজো।

'থিম' এখনও ঢোকেনি এসব পুজোয়। উৎসব আছে, তবে পুজো এখনও পুজোই। সেখানে ত্রুটিবিচ্যুতি বড়ো একটা চোখে পড়ে না। নেই রাজনৈতিক দলাদলি, নেতার দাদাগিরি। আছে সাধ্যমতো সমাজকল্যাণের তাগিদ, সাংস্কৃতিক প্রয়াসও। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নেতা থাকলেও অগ্রাধিকার পান গৈরিক বসনধারীরাই। আজকের দিনে এর চেয়ে বেশি কিছু চাওয়া বোধহয় সমীচীন হবে না। □

পুজোমণ্ডপে অল্পবয়েসিদের সেলফি তোলা দেখতে ভালো লাগে

নীলাঞ্জনা রায়

ছোটোবেলার পুজোর আনন্দ সীমাবদ্ধ থাকত নতুন জামা, নতুন জুতো আর ঠাকুর দেখার মধ্যে। শৈশব, যৌবন পেরিয়ে এসে আজও মহালয়ার ভোরে বেতার তরঙ্গে মহিষাসুর মর্দিনীর আবাহন শুনতে শুনতে মনে পড়ে শৈশবে মহালয়ার আগেরদিন রাতে রেডিয়োটিকে ঠিক করে রেখে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাবার কথা। আজকের কিশোর মনে হয়তো এই অনুষ্ঠান তেমন করে আকর্ষণ তৈরি করতে পারে

না। তবে পুজোর সময় নবীন প্রজন্ম যখন ঠাকুর দেখতে দেখতে সুন্দর করে সেলফি তোলে, আমরা তো তা পারতাম না, দেখে বেশ ভালোই লাগে।

পুজোর ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় মায়ের হাত ধরে পাড়ায় যে প্রতিমা দর্শন করতে যেতাম, এখন সেই পুজোর আয়োজনের অবয়ব এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে সেই মণ্ডপে অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি হোঁচট খেয়ে ফিরে। আমাদের সময়ে উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল পুজোর গান। স্বনামধন্য শিল্পীদের গাওয়া রেকর্ড প্রকাশ করত বিখ্যাত রেকর্ড কোম্পানি। 'শারদঅর্ঘ্য' নামে সংগীতের সেই ডালি সংগ্রহের চাহিদা ছিল মনে রাখার মতো। এখনও পুজোর গান প্রকাশিত হয় কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া আর ডিজিটাল মাধ্যমের গুণে তাকে রেকর্ডের গান শোনার উৎসাহের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

ছোটোবেলায় মাকে দেখতাম পুজোর বাজার করতে। বিশেষ করে ষষ্ঠীর দিন একটি লালপাড় শাড়ি সেই তালিকায় থাকত। বাড়িতে তাঁতিরা এসেও শাড়ি বিক্রি করতেন। পুজোর আগে আত্মীয় প্রতিবেশী অনেক সময় পুজোর বাজার দেখতেই বাড়িতে আসতেন। এখন এই জায়গাটিও অনেকাংশে দখল করেছে অনলাইন শপিং। বর্তমান কর্মব্যস্ত জীবনে সময় সাশ্রয়কারী এই পদ্ধতি অবশ্য উপকারী, একথা মানতেই হবে।

আমরা দেখতাম বড়োরা পুজোর উপহার নিজেরাই কিনে আনতেন। এখন উপহার হিসেবে অনেক ক্ষেত্রেই নিকট আত্মীয় স্নেহের পাত্র-পাত্রীকে অর্থমূল্য ধরে দেওয়ার এক প্রথার প্রচলন হয়েছে। বর্তমান সময়ে সারা বছরই কিন্তু কেনাকাটার কাজ চলতেই থাকে, তাই পুজোর বাজার করার আনন্দ উত্তেজনায় কিছুটা যেন ভাটা পড়েছে। আমার ছোটোবেলায় পুজোর বড়ো একটি আকর্ষণ ছিল পূজাসংখ্যা— দেবসাহিত্য কুটির, সন্দেশের শারদীয়া বাংলা পূজা বার্ষিকীর রংবেরঙের হার্ড কভার আজও চোখে ভাসে।

শিশুদের জন্য পূজা বার্ষিকী এখনও প্রকাশিত হয়, কিন্তু ডিজিটাল যুগ অনেকাংশে বই পড়ার আগ্রহে বাধা সৃষ্টি করছে। তাই পুজোসংখ্যা নিয়ে কৈশোরের উৎসাহ তেমন করে চোখে পড়ে না। আমি কিন্তু পূজা বার্ষিকীর নতুন কাগজের ঘ্রাণে আজও শৈশবের উত্তেজনা অনুভব করি। ছোটোবেলায় পুজোর ক'দিন আনন্দের মধ্যে ছুটির শেষে স্কুল খুলেই বার্ষিক পরীক্ষার ভীতিটা মনের মধ্যে কালো মেঘের মতো দেখা দিত। এখন শিশুরা সেই ভয় থেকে অনেকটা মুক্ত, কারণ সারা বছরই তাদের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে।

পুজোর শেষে বিজয়ার প্রণাম পর্বটিও আমাদের কাছে সে সময়ে বেশ আকর্ষণীয় ছিল। বাড়িতে অনেকে আসতেন, আমরাও প্রণাম করতে যেতাম। আসা-যাওয়া মিষ্টিমুখ, আদর, আশীর্বাদের স্পর্শে কদিন বেশ আনন্দে কাটত। এখন তো বিজয়া সীমাবদ্ধ হয়েছে এসএমএস আর হোয়ার্টসআপ-এর মাধ্যমে। তবে এই মেসেজ আদান প্রদানেও অনেক উদ্ভাবনী চিন্তার প্রকাশ বেশ মুগ্ধ করে।

ভক্তি, আবেগ, ভালোবাসা, আনন্দ সবকিছুর সামগ্রিক মিলিত অভিব্যক্তি দুর্গাপূজা। ধুনোর গন্ধ, কাঁসর ঘণ্টা, শঙ্খধ্বনি, ঢাকের বোলে আজও মনটা কিছুক্ষণের জন্য সজীব হয়ে ওঠে। বুঝতে পারি মা তাহলে এসে গেছেন, হয়তো তাঁর আগমনে হতাশা, দুঃখ, দৈন্যের অবসান হবে। □

চিকিৎসা রোগের উপশম করে, মৃত্যুরোধ করতে পারে না

সংবাদে প্রকাশ, করোনার তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়তে চলেছে। সত্যিকথা বলতে কী তৃতীয় ঢেউ-ই শেষ কথা নয়। যাকে করোনা বলা হচ্ছে, তা আগেও ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কারণ যা ছিল না তা আসবে কোথা থেকে? যেমন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের আগেও মাধ্যাকর্ষণ ছিল, তেমনি করোনা আবিষ্কারের আগেও করোনা ছিল এবং মানুষ করোনায় আক্রান্ত হতো। কিন্তু এই বিষয়টা আমাদের জানা ছিল না।

আয়ুর্বেদ মতে, 'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা-ই আছে দেহভাণ্ডে'। আয়ুর্বেদ অনুযায়ী বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন ধাতুর মানুষ আছে। কেবলমাত্র কফ ধাতুর মানুষেরাই তথাকথিত করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে। সমগ্র ভারতে একশো পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষের মধ্যে ২৫ কোটি করোনাপ্রবণ মানুষ রয়েছে। প্রতি বছরেই কিছু মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়। অধিকাংশই সেরে উঠে। কিন্তু যাদের মরার সময় হয়, তারাই মারা যায়। কারণ করোনা মৃত্যুর কারণ নয়। 'কাল' বা সময় মৃত্যুর কারণ। মনে রাখা দরকার, চিকিৎসা রোগের উপশম করে, মৃত্যু রোধ করতে পারে না।

হস্তরেখা বিজ্ঞান অনুযায়ী পৃথিবীতে সাত রকমের মানুষ আছে। বিশ্ববিখ্যাত হস্তরেখা বিজ্ঞানী উইলিয়াম জি. বেনহাম লিখেছেন— 'Seven distinct types of people were first created. Each of these types represented certain strong qualities, certain strong aptitudes, certain virtues and certain faults, as well as peculiarities of health and characters.' (The Laws of Scientific Hand-Reading, p-4)। সাতটি টাইপের মধ্যে কেবল জুপিটারিয়ানদেরই করোনা হচ্ছে। শতকরা প্রায় ১৫ জন মানুষ জুপিটারিয়ান।

—নরেন্দ্রনাথ মাহাতো,
স্কুলবাজার, পশ্চিম মেদিনীপুর।

করমপুজোর গিরিকদম্ব অনেক কথাই বলছে

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ছিল করমপুজো বা করমপরব। করমপূজা পবিত্র চান্দ্রতিথি একাদশী হিসেবে হয়। ওরাওঁ, মুণ্ডা, সাঁওতাল, খারিয়া প্রমুখ জনজাতিদের সবচেয়ে বড়ো পরব করম বা করমা। বর্তমানে পরব উৎসবের রূপ নিয়েছে। এই উৎসব ভাদ্রমাসের পুণ্য জোৎস্না একাদশী তিথিতে রাত্রে পালন করা হয়। এই পুজোতে করম বা করমা গাছের বা ডালের পুজো করা হয়। গাছটি পাহাড়ে, বনে খোঁজ করে সংগ্রহ করতে হয়। গাছের নাম 'গিরিকদম্ব' বা 'বনকদম্ব'। অর্থাৎ পাহাড়, গিরি বনে জন্মায় কদম্ব গাছ। আমরা সাধারণত যে কদম গাছ দেখি সেটা নয় কিন্তু। গিরিকদম্ব গাছ ফল দেয়। গাছটি পাতাঝরা অর্থাৎ শীতকালে সব পাতা ঝরে পড়ে। এই গাছের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর ছাল ছাড়ালে শরীর থেকে হলুদ বর্ণ ভেসে আসে। এই জন্য এই গাছ 'হলুদ' নামেও পরিচিত। এই গাছের উচ্চতা সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ হাত। হলদে অর্থাৎ পীতাভ হওয়ায় আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তাই গাছটি বনবাসীদের কাছে শ্রীবৃদ্ধি, ক্ষমতা, যৌবন ও কৃষি বিকাশের প্রতীক। লোক বিশ্বাস, এই গাছের পুজো করলে যৌবন ধরে রাখা যায়। করম পুজোয় মূল ভূমিকা থাকে কুমারী মেয়েদের, যারা সুন্দর যৌবনভরা স্বামী কামনা করতেই পারেন। সাধারণভাবে যৌবন রাত্রে সক্রিয় থাকে, তাই পরবের পুজো সন্ধ্যায় শুরু করে রাতেই শেষ করে দিতে হয়। বিয়ে ও সন্তান জন্মানো এক সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া, তাই অঙ্কুরিত বীজ ফসল সৃষ্টির কথাই বলে।

স্মরণীয়, করম গাছ আসলে বনকদম্ব। এক প্রজাতির কদম গাছ। কদম গাছের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যোগসূত্র রয়েছে। বিশেষ করে বাল্যক্রীড়া। আমরা জেনেছি গিরিকদম্বের ছাল ছাড়ালে হলুদ বা পীতবর্ণ দেখা যায়, যা পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণেরই কথা বলে। বলতে গেলে গিরিকদম্ব হচ্ছে কৃষ্ণকদম্ব। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, করম পুজো মূলত শ্রীকৃষ্ণ পুজোর একটি রূপ। আবার করমপুজোয় করম ও ধরম-উপখ্যান রয়েছে যেখানে করম অর্থাৎ কর্মকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বিশেষভাবে লক্ষনীয়, শ্রীকৃষ্ণের গীতায় 'কর্ম' হচ্ছে মূলকথা। এই 'কর্ম'-এর সূত্র ধরেই করম-ধরম-এর কথা করম পুজোয় এসেছে। পরিশেষে বলতে হয়, করম পুজোর সূচনা হয়েছিল কর্মকে কেন্দ্র করে, পরবর্তীতে আনুষঙ্গিক অনেক আচার আচরণ যোগ হয়ে যায় যা আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ উ: দি:।

সেবাকাজের মূলভাবনা আধ্যাত্মিকতা

গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে অনেকগুলি সংখ্যার স্বস্তিকা হাতে পেলাম। তার মধ্যে ৯ শ্রাবণ ১৪২৮-এর সংখ্যাটি যার প্রচ্ছদে 'সংকটকালে স্বয়ংসেবকদের সেবাকাজ' সংরক্ষণ যোগ্য একটি সংখ্যা। সত্যনারায়ণ মজুমদারের লেখা থেকে জানলাম তাঁর 'সেবার মূল প্রেরণা আধ্যাত্মিকতা'। কথাটি সত্যিই একটি মূল্যবান কথা বলেই আমার অনুভব। আধ্যাত্মিকতা বর্জিত যে সেবাকাজ সেটাকে একটি জড়বাদী চিন্তার স্রোত বললেও কম বলা হয়। আখের গোছাবার জন্য বেশ কিছু সেবাকাজ আজকাল সংগঠিত হয়। আবার রাজনৈতিক অঙ্গনটা একটু মজবুত হোক— এই ভাবনাও কাজ করে। কিন্তু সত্যিকারের সেবাকাজ বেশ কিছু মানুষের মনে প্রেরণাস্রোত জাগ্রত করে। নিজের চিত্তশুদ্ধি করাটাই সেবার মূল লক্ষ্য, আর তার জন্য চাই শুভবুদ্ধি, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, তথা আধ্যাত্মিকতা। সত্যি বলতে কী 'অনেক ঈশ্বর-অবিশ্বাসীও লোক দেখানোর জন্য

অনেক কাজ করে— যা সেবাকাজ রূপে জনসাধারণের মধ্যে গণ্য হয়। শ্রীমজুমদার প্রকৃতই বলেছেন, সর্বোচ্চ জীবনীশক্তি বা আধ্যাত্মিকতার এই হলো মূল সিদ্ধান্ত যা সমাজের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি ও সুন্দরভাবে তাকে পরিচালনা করার শক্তি প্রদান করে এবং যার মাধ্যমে ভিতরের ও বাইরের সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে। ফলস্বরূপ এই শক্তি সমাজের অস্তিত্ব ও বিকাশের সহায়ক হয়ে উঠেছে। আর এইরকম কাজের ধারক ও বাহক হচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ মোটেই কোনো জড়বাদী চিন্তার প্রতিভূ নয়, বরং অনেকটাই আধ্যাত্মিকতার অনুসারী।

—দীপক খাঁ,
পাটপুর, বাঁকুড়া।

ভণ্ডদের মুখে সাভারকরের নিন্দা শোভা পায় না

আমার একটা বদগুণ কোনো অন্যায় দেখলে চুপচাপ বসে থাকতে পারি না, সম্প্রতি তিনটি সংবাদ পড়ে ধৈর্যহারা হয়ে এই প্রতিবেদনের অবতারণা।

(১) সম্প্রতি উত্তর প্রদেশ বিধানসভার গ্যালারিতে বীর সাভারকরের ছবি টাঙানো নিয়ে প্রবল বিতর্ক। কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টির অভিযোগ, যোগী সরকার সাভারকরের ছবি টাঙিয়ে সব দেশপ্রেমিককে অপমান করেছে। যুগশঙ্খ ২১.১.২১, কলম ২০.১.২১।

(২) সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডব্লুউ.বি.সি.এস. পরীক্ষার প্রশ্ন পত্রে জানতে চাওয়া হয়েছে কোনো বিপ্লবী নেতা জেল থেকে মুক্তিলাভের জন্য মার্সি পিটিশন (ক্ষমা প্রার্থনা) দাখিল করেন। যুগশঙ্খ ২৬.৮.২১।

(৩) দিল্লিতে নতুন কলেজের নামকরণ সাভারকরের নামে করা নিয়ে বিতর্ক। কলম ২৬.৮.২১।

বীর সাভারকরের জন্ম ২৮ মে ১৮৮৩ সালে মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার ভগুর গ্রামে এক চিৎপাবন ব্রাহ্মণ বংশে। ১৯০৬ সালে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার প্রদত্ত স্কলারশিপ নিয়ে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেত যান। বিলেতে তার বৈপ্লবিক কাজকর্মে ভয় পেয়ে ইংরেজ সরকার তাকে বন্দি করে জাহাজে ভারতে পাঠানো স্থির করেন। ভারতে আসার পথে তিনি ফ্রান্সের মার্সেলস্ বন্দরে জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পলায়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু গ্রেপ্তার হয়ে দেশে আনীত হন। ১৯১০ সালে বিচারের নামে প্রহসন করে ইংরেজ সরকার তাকে ৫০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেলে স্থানান্তরিত করে। সেখানে তাকে রাখা হয় তিন তালার একটি ছোটো কামরায়। তাকে পরতে দেওয়া হয় পাটের সুতায় তৈরি হাফপ্যান্ট ও একটি কুর্তা, পায়ে পরিয়ে দেওয়া হয় লোহার ডান্ডাবেড়ি— এই অবস্থার তাকে দিয়ে তেলের ঘানি টানানো হয়। সরকারের বরাদ্দ মতো তেল উৎপাদন না করতে পারলে পাঠান মুসলমান প্রহরীদের চাবুকের বাড়ি এবং অশ্রাব্য গালিগালাজ, সেলের মধ্যে সারা দিনের স্নান, বাসন ধোওয়া, জামাপ্যান্ট ধোওয়া, শৌচকর্ম ইত্যাদির জল বরাদ্দ ছিল এক টিন সমুদ্রের নোনা জল। পানীয় জলও বরাদ্দ ছিল খুব কম পরিমাণ। তৃষ্ণায় বুক ফেটে গেলেও বাড়তি পানীয় জল দেওয়া হতো না। মলমূত্র ত্যাগের জন্য দেওয়া হতো এ দেশে নলেন গুড়ের ছোটো মাটির সরু লম্বা একটা হাড়ি যাতে এক সাথে মল ও মূত্র ত্যাগ করা যেত না। প্রথমে মূত্র ত্যাগ করে তারপর মল ত্যাগ করতে হতো, শৌচকর্মও ওই হাড়িতে করতে হতো।

সারাদিনে ২৪ ঘণ্টায় জমাদার একবারই ওই মলমূত্র সংগ্রহ করতো। দুর্গন্ধে ঘরে টেকা দায়। যদি কোনো কারণে ওই লম্বা হাড়ি কাত হয়ে কামরার মধ্যে পড়ে যেত তবে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করার কোনও ব্যবস্থা ছিল না, দুবেলার খাবার ব্যবস্থা ছিল ইঁদুর লাদি, আরশোলার লাদি-সহ কচুর শাক ইত্যাদি দিয়ে তৈরি লপসি জাতীয় খাবার। পাঠক হয়তো অবগত আছেন আন্দামানে সারা বছর প্রচুর বৃষ্টি হয়, একটা কাপড় ভিজলে তিনদিন লেগে যায় শুকাতে। এই অবস্থায় তাঁর সেলে পাটের তৈরি জামা প্যান্ট শুকানোর জন্য কোনো দড়ি দেওয়া হতো না যাতে গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা না করতে পারেন। অবসর সময় দুই হাতে ধরে জামাপ্যান্ট শুকানোর ব্যবস্থা করতে হতো। সন্ধ্যাবেলা এক ঘণ্টার জন্য অন্য কয়েদিদের ঘরের সামনে বারান্দায় হারিকেনের আলোর ব্যবস্থা থাকলেও সাভারকরের ঘরের সামনে কোনো হারিকেন রাখা হতো না। এভাবে ১০ বছর একটা ছোটো কুঠরির মধ্যে আবদ্ধ থেকে তিনি যদি ইংরেজদের কাছে মার্সি পিটিশন করে থাকেন তাতে কি তিনি অন্যায় করেছেন? যে সব নেতা সাভারকরের নিন্দা করছেন তারা দেশের জন্য কি ত্যাগ স্বীকার করেছেন? তারা মলমূত্র ছাড়া আর কিছুই ত্যাগ করেননি।

স্বাধীনতার পর চুরিচামারি করে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। এই দেশদ্রোহীদের মুখে সাভারকরের নিন্দা শোভা পায় না। ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময় মাহাত্মা গান্ধী পুনের আগাখাঁন প্যালেসে বন্দি ছিলেন। তার খাদ্য তালিকা এইরকম— সকালে উপাসনার পর ২০টি কমলা লেবুর রস খেতেন এক গ্লাস ছাগলের দুধের সঙ্গে, দুপুরে তিনপোয়া আন্দাজ ছাগলের দুধ ঘন করে যাবতীয় সবজি দিয়ে স্যালাড তৈরি করে খেতেন। তাঁর প্রধান শিষ্য জহরলাল আমেদনগর কোর্টে বন্দি ছিলেন। তার প্রিয় খাদ্য ছিল একটি বড়ো মুরগির মাঝখান চিরে তার মধ্যে একটি কচি মুরগি মশলা মাখিয়ে তা মাখনের মধ্যে অল্প আঁচে ফুটিয়ে গরম গরম খাওয়া। অতএব আবার বলবো, এই ভণ্ডদের সুখে সাভারকরের নিন্দা শোভা পায় না।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
কলকাতা-৬৪।

With Best
Compliments from :
A
Well
Wisher

বদলায় মন, বদলায় প্রথা

অনামিকা দে

কোনও এক বারোয়ারি পুজোমণ্ডপে চওড়া লালপেড়ে শাড়ি আর বড়ো লাল টিপ পরে শুদ্ধভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে পুজোর আয়োজন করছেন একজন মহিলা পুরোহিত— এই চিত্রটি খুব একটা চিরাচরিত নয়। সাধারণত সাদা ধুতিতে কোনো পুরুষ পুরোহিত দেখতেই আমারা অভ্যস্ত। ধারাবাহিকতার বাইরে বেরিয়ে তাই নতুন চিত্রটিকে হয়তো বেশ খানিকটা আলোচনার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু বর্তমানে সমাজের সকল কর্মক্ষেত্রেই তো নারীরা সাবলীল ভাবে তাদের কর্মদক্ষতা প্রমাণ করছে। আজকের নারী তাই নিজেরাই একেকজন দুর্গা, তাহলে পৌরোহিত্য বা ঢাকির সাজেই-বা তারা পিছিয়ে থাকেন কেন?

কলকাতার বুকে এই চিরাচরিত চিত্রটি পালটানোর দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছে দক্ষিণ কলকাতার ৬৬ পল্লি দুর্গাপুজো কমিটি। এতদিনের চেনা ছবিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মা দুর্গার আবাহনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন চারজন নারীর হাতে। নন্দিনী, রুমা, সেমন্তী ও পৌলমী। হ্যাঁ, এই চারজনই পৌরোহিত্য করবেন এবার ৬৬ পল্লিতে, তাদের হাতেই হবে ষষ্ঠীর বোধন। হয়তো সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের ভ্রূকুটি সহ্য করতে হবে এই চার ব্যতিক্রমী নারীকে কিন্তু তাতে সত্যি কি কিছু এসে যায়? চিরকালই তো ব্যতিক্রমের হাত ধরেই সমাজ পরিবর্তন হয়েছে। গত ২২ আগস্ট খুঁটি পুজোর মাধ্যমে সেই পরিবর্তনের শুভ শঙ্খধ্বনি বেজে গিয়েছে। পুজোর অন্যতম কর্মকর্তা প্রদ্যুম্ন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'এবার মায়েদের হাতে মায়ের আবাহন হবে ৬৬ পল্লির পুজোয়। পুজোর দায়িত্বে চারজন মহিলা পুরোহিত। সমস্ত আচার মেনে হবে পুজো। পুজোর কাজকর্মে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ ঘোচানোই মূল উদ্দেশ্য। মা দুর্গার পুজো সবাই করতে পারেন, তাতে লিঙ্গবৈষম্য থাকবে কেন!'

ব্যতিক্রম আরও আছে। দেবীপক্ষের শুরু থেকে বিসর্জনের সুর পর্যন্ত যে ছন্দের বোল ছাড়া অসম্পূর্ণ শারদীয়ার অনুভূতি

সেই ঢাকের কাঠিতে হাত লাগিয়েছে আজকের ব্যতিক্রমি নারী। দুর্গাপুজোয় শহর থেকে গাঁ, গমগম করে যে ঢাকের আওয়াজ তাতে যে পুরুষদের একাধিপত্য রয়েছে তাতে তো দ্বিমত নেই। সেকারণেই ঢাকি শব্দের প্রচলন, বাংলা ব্যাকরণে ঢাকির লিঙ্গ ভেদে কোনো শব্দ মেলে না। তবে সেই চিরাচরিত চিত্রটিকেও বদলে দিচ্ছে সনাতনী সমাজের মাতৃশক্তিরা। কথায় বলে 'ঢাক' বাজাতে কবজির জোর চাই, কিন্তু মায়ের নরম হাতের স্পর্শেও ঢাকের বোল ফুটে উঠছে, সেখানেও নারী হয়েছে অনন্যা।

উত্তর ২৪ পরগনার মছলন্দপুরের গোকুলচন্দ্র দাস একজন প্রসিদ্ধ ঢাকি। তাঁর মাথাতেই প্রথম চিন্তাভাবনা আসে যে মায়ের আরাধনায় পুরুষদের একচ্ছত্র ঢাক বাজানোর একাধিপত্যের মানসিকতা তাকে বদলাতে হবে। ঢাকি সমাজের এই নতুন দিকের অভ্যুত্থানটা তাঁর পরিবারের হাত ধরেই শুরু হয়। পুত্রবধূ, ভাগ্নেবউ, মেয়ে, ভাইঝি এঁদের নিয়েই শুরুটা করেছিলেন। বাড়িতে প্রতিদিন নিয়ম করে প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। চেনা ছবির বাইরের এই উদ্যোগ পছন্দ হয়নি পাড়াপ্রতিবেশীদের। প্রথা ভাঙার দায়ে নিয়মিত বাঁকা শব্দে বিদ্ধ হতে হয়েছে তাদের। সালটা ছিল ২০১০। সে বছরই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে মহিলাদের ঢাকের দল। সারা রাজ্য জুড়েই শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌরাত্ম্য তখনও এত প্রকট ছিল না, তাও লোকের মুখেই মুখেই ছড়িয়েছিল নাম। সে খবর পৌঁছেছিল বিদেশেও। প্রথম প্রয়াসেই এসেছিল বিপুল সাফল্য, একের পর এক বায়নায় হিমসিম খেয়েছেন তাঁরা। ২০১৮-তে প্রথম বিদেশ পাড়ি দেন এই প্রমীলা ঢাকিবাহিনী। তানজানিয়ার বাঙ্গালি সংগঠনের পুজোয় ঢাক বাজিয়েছেন তাঁরা। এছাড়া কলকাতার পুজো তো আছেই। কলকাতার প্রথম সারির পুজো সুরুচি সঙ্ঘের নিয়মিত ঢাকি তাঁরাই। গোকুলচন্দ্র বলছেন, 'মায়ের আরাধনায় কেন ব্রাত্য থাকবে নারীরা? বদলাচ্ছে মন, বদলে যাচ্ছে প্রথা।' মহিলা ঢাকির দল এখন দেশ-বিদেশে সমাদৃত, কোনো তির্যক মন্তব্য আসে না তাঁদের দেখে। যারা তখন সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন তারাই এখন মন থেকে চায় তাদের মেয়েরাও ঢাক বাজাতে শিখুক।

সুতরাং সমাজের মাতৃশক্তির মধ্যে দশভুজা মায়ের এই রূপ আমাদের মনে করিয়ে দেয় আজকের নারী শুধু মুখে ক্ষমতায়নের বুলি আওড়ায় না, তারা প্রকৃত অর্থেই লিঙ্গবৈষম্যের তর্কবিতর্ককে কাটিয়ে উঠে সুস্থ বৈষম্যহীন স্বাধীন সমাজ গঠনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ঘরোয়া পুজোয় খুঁজে পাই ছেলেবেলার মাকে

সুতপা বসাক ভড়

শরতের সুনীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, একরাশ সোনাঝরা রোদ্দুর, ঘাসের ওপর শিউলি ফুলের আভরণ, মাঠে-ঘাটে-রেললাইনের ধারে ধারে

কাশফুলের সারি, নদীতে পাল তোলা নৌকার ভেসে যাওয়া, হাওয়াতে মন কেমন করা একটা গন্ধ— আরও কত কী? প্রকৃতি নিজেকে সাজিয়েগুছিয়ে তৈরি হয়ে আছেন মাকে স্বাগত জানানোর জন্য। এদিকে আমরা দেখি যে, ইতিহাসে এই শরৎ ঋতুতেই পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র অকালবোধন করে মৃন্ময়ীর মধ্যে চিন্ময়ীর আরাধনা করেছেন। আমরা তা চিরস্মরণীয় করে দেবী দুর্গাকে বসিয়েছি আমাদের হৃদয়াসনে। মা কৈলাস থেকে আসেন মর্ত্যলোকে বাপের বাড়ি। মূর্তিকারেরা মার চোখ ও অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া প্রায় সবকিছু দিয়ে মাকে সাজিয়ে তুলেছেন। তারপর একটি বিশেষ দিনে শুভ মুহূর্তে উপবাস করে, গঙ্গস্নান সেরে সিক্তবস্ত্রে তুলির একটিমাত্র টানে করেন মায়ের চক্ষুদান। মা হলেন জাগ্রতা। মহালয়ার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হলো মায়ের আগমনবার্তা। মণ্ডপের শেষ পর্যায়ের কাজ চলতো চরম দ্রুততায়। এদিকে সারাবছর জমিয়ে রাখা জামাকাপড়ের সঙ্গে যোগ হলো আরও কিছু। তারপর খবরের কাগজ মনে করিয়ে দিতো— 'পুজোয় চাই নতুন জুতো।' সুতরাং, কয়েক দশক আগে যখন খুদেদের দলে ছিলাম, তখন খুব আনন্দ হতো। বড়োরা পুজো এলে মুচকি হাসতেন– প্রশ্রয়ের হাসি। তবে আনন্দ হতো সবার মনে। এখানে কৃপণতার কোনো স্থান ছিল না। লক্ষ্য রাখা হতো, পাড়ার দরিদ্রতম পরিবারটিও যেন পুজোয় নতুন জামাকাপড় পায়। বাড়ির কাজের লোকেদের পুজোর বাজারও একইসঙ্গে হতো। পুজোর ওই আনন্দ ভাগাভাগি হয়ে তা অনেকগুণ বেড়ে যেতো।

অবশেষে মা মণ্ডপে এসে অস্ত্রধারণ করতেন। সন্ধ্যেবেলা বেলতলায় পুজো, সকালে নবপত্রিকা স্নানের মাধ্যমে মনটা যেন খুশিতে নেচে উঠত। আলোকসজ্জা তখনও হতো। ষষ্ঠীর সন্ধ্যেবেলা উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতাম, আজ সব সাজানো ঠিকঠাক হবে তো? তারপর শুরু হতো 'ঠাকুর দেখা'। এ মণ্ডপ থেকে সে মণ্ডপ। অল্প ভিড়ে একদম কাছ থেকে 'ঠাকুর দেখা'। ভালো করে বিচার করা হতো গণেশের একটা দাঁত কতটা ভাঙা, ভুড়িটা কত বড়ো, নেংটি ইঁদুরটা একটু বেশিই ছোটো হলো কিনা। মা-লক্ষ্মীকে সবসময়ই ভালো লাগত, কী সুন্দর দেখতে! চুপটি করে সেজেগুজে মার পাশে থাকেন। প্যাঁচাটিও চুপচাপ।

ওদিকে মা-সরস্বতীকে একটু সম্ভ্রম করতেই হতো, কারণ পুজোর পরেই হতো বার্ষিক পরীক্ষা; সুতরাং... । কখনো কখনো মনের ভুলে তাঁর হাঁসটিকেও নমস্কার করেছি। আর কার্তিক ঠাকুর বেশ সাজগোজ সচেতন ও যোদ্ধা মানুষ, তাঁর মধ্যে একটা বীরত্বের ভাব, সঙ্গে ময়ূর। সবশেষে মা-দুর্গার সিংহ কীভাবে মহিষের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা মহিষাসুরকে আক্রমণ করছে— তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। এগিয়ে মা-দুর্গা স্বয়ং বড়ো বড়ো চোখে মহিষাসুরের দিকে তাকিয়ে থাকলে বেশ লাগে। মনে হতো, 'বোঝো এবার কার সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছিলে।' মার পেছনে শিবঠাকুরের ছবিটিও ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নেওয়া হতো। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিথিগুলো যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো এসে অনেক আনন্দ দিয়ে ফিরে যেত। আসত বিজয়া দশমীর প্রণাম পর্ব। এই সময় মনটা খুব খারাপ হয়ে যেত। আবার আগামী পুজোর আশায় হাঁ করে থাকা— কয়েক দশক আগে এই ছিল আমাদের পুজো।

গত কয়েক বছর ধরে সমাজে দুর্গাপুজোর পালনের পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আমরা খুব বেশি আড়ম্বরের মধ্যে প্রবেশ করেছি। শারদীয়া দুর্গাপূজা করছি, অথচ এই পুজোর প্রবর্তন যিনি করেছেন, সেই শ্রীরামচন্দ্রকে অস্বীকার করতে চাইছি। প্রকৃতি এখনো এইসময় নিজেকে সাজিয়ে তোলেন, অথচ সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাইছি। সবই করছি চূড়ান্ত ভোগের মোড়কে। এখানে ভক্তি-ভালোবাসা, ত্যাগ এগুলির স্থান সংকুচিত হয়ে আসছে। ভোগের অনাবশ্যক প্রয়োগ ও প্রচারের আড়ালে ম্লান হয়ে যেতে বসেছে সেই 'ভাগ করে বেড়ে যাওয়া আনন্দ'। যে মা-দুর্গার বড়ো বড়ো চক্ষুত্রয় দেখে বুকটা সাহসে ভরে যেত— সেই মাকে মণ্ডপে খুঁজে পাই না। শিল্পী সেখানে ভগবানের থেকেও বেশি গুরুত্ব পান। 'থিম'-এর ভিড়ে 'মা' যেন হারিয়ে গেছেন। তবে, তাঁকে খুঁজে পাই ছোট্ট ঘরোয়া ভক্তিভরে নিবেদিত পুজোর মধ্যে, পাই কম-খরচের পাড়ার পুজোতে। এখানে মা স্বমহিমায় এখনও অধিষ্ঠিতা। ঐশ্বর্য, প্রযুক্তি, থিম, পুরস্কার— এসবের থেকে অনেক দূরে স্বমহিমায় বিরাজমানা মা দুর্গাকে আমরা এখনো পাই। দেখতে পাই মায়ের স্বর্গীয় বিভা : গর্ভধারিণীর প্রতিচ্ছবি মা দুর্গার মধ্যে। মনে হয় কিছুই তো হারায়নি! মা-দুর্গা আছেন যথাস্থানে, আমাদের হৃদয়াসনে! ◻

তুষ্টুর গড়া সিংহ হাঁ করে লাফ মারত

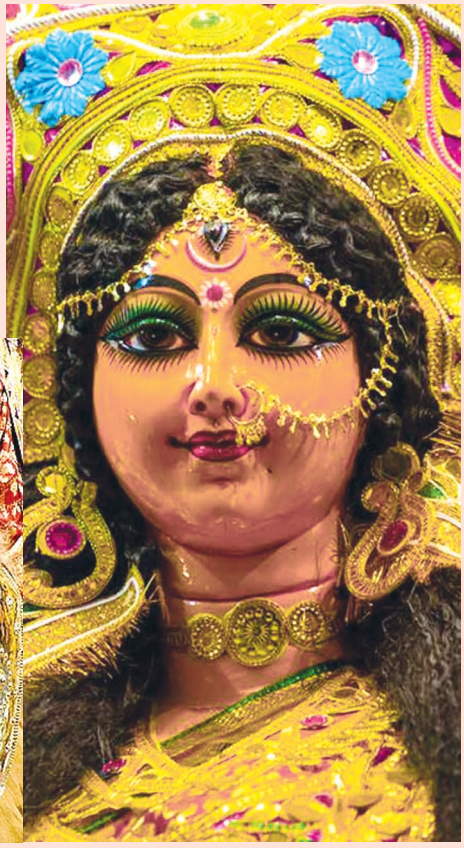

নন্দলাল ভট্টাচার্য

গন্ধ দিয়ে যায় চেনা। শুরুটা করা যায় বোধহয় ওই ভাবেই, এ গন্ধ বড়ো চেনা। গ্রাম হোক কিংবা শহর, সব জায়গাতেই এই সুবাসই বলে দেয় পুজো আসছে। আশ্চর্য একটাই— গন্ধটা কখনও ফিকে হয় না। জীবনের সব পর্বেই অনুভব করা যায় এই গন্ধ। সময়ের ফেরে প্রতিক্রিয়া হয়তো হয় ভিন্ন, কিন্তু গন্ধটা যেন চিরকালের। ভোলা যায় না তাকে কোনো সময়ই। তাই বড়ো বেলায় এমনকী জীবন থেকে ছুটির সময়ও ছেলেবেলার সেই গন্ধটা টের পাওয়া যায় নির্জন একান্ত মুহূর্তে।

নিজের কথায় বলতে হয়, থাকতাম তারকেশ্বরে। জন্মের পর থেকে বছর বিয়াল্লিশ পর্যন্ত। জায়গাটা শহর নয় মোটেই। তবে গ্রামও ঠিক নয়, গঞ্জ বোধহয় বলা যায়। আজকের তারকেশ্বরকে দেখে কল্পনাও করা যায় না সেদিনের তারকেশ্বরকে। এস্টেট— যাকে বলা হয় রাজবাড়ি, সেখান থেকে মন্দির পর্যন্ত ছিল পাথর বসানো পাকা রাস্তা। বাকি সব মাটির। যান বলতে গোরুর গাড়ি আর নিজস্ব কিছু সাইকেল। বর্ষাকালে রাস্তার কোথাও কোথাও দেখা যেত কোমর কিংবা বুক সমান দঁক— থকথকে কাদা মাটি। বেচারা গোরু দুটো সেই দঁকে পড়ে উঠতে পারত না কিছুতেই। প্রায় অনড় সে গাড়ি অনেক সময়ই দঁক পেরেতো পথ চলতি মানুষের হাতের ঠেলায়।

এহেন তারকেশ্বরে কোথাও কাশফুল দেখা যেত না। শিউলির সুবাস মিলত কদাচিৎ। আকাশে অবশ্য সাদা মেঘের ভেলা। তবে তা দেখে নয়, স্কুল বাড়িতে ঠাকুর গড়া শুরু হতেই বুঝতাম পুজো এসে গেছে। সে সময় তারকেশ্বরে একটাই পুজো হতো। সে পুজোর প্রতিমা গড়তে আসতো অঞ্চলের সেরা এক মৃৎশিল্পী, নাম তার তুষ্টু। প্রতিমার কাঠামোয় খড় বাঁধার সময় থেকেই ভিড় জমাতাম স্কুলের বোর্ডিং বাড়িতে। সেখানেই তুষ্টু মিস্ত্রির হাতের জাদুতে এক মেটে, দু'মেটের পর সব যেন জীবন্ত। একচালার ঠাকুর। সিংহের ওপর দাঁড়িয়ে মা দুর্গা ত্রিশূল বিঁধছেন মহিষাসুরের বুকে। দেবী দুর্গার সঙ্গে তাঁর চার ছেলে-মেয়ে— কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী। তবে ঠাকুর গড়ার প্রথম থেকেই নজর কাড়তো সিংহটা।

একহারা চেহারার তুষ্টু মিস্ত্রি ছিল ভারী দুষ্টু। গল্প বলতো বেশ রসিয়ে। তবে মাঝে মাঝে একটু বিরক্তও হতো। বলতো, মেলা ঝামেলা করো না। সিংহটা রেগে যাচ্ছে। এখুনি হাঁ করে মারবে এক লাফ।

—ধুর তাই কখনও হয়!

—দেখ তাহলে। কথাটা বলেই খানিকটা কাঁচা মাটি তুলে নিত হাতে। তারপর মাটি পাকিয়ে সেটা লাগিয়ে দিত সিংহের পেটের নীচে। তাতে ছিটিয়ে দিত জল। টসটস করে পড়ত তা মাটিতে। সেটা দেখিয়ে বলত তুষ্টু, ওই দেখ, হিসি করছে সিংহটা। এবার দেবে কিন্তু লাফ।

—সত্যি!

—সত্যি! সত্যি, সত্যি। তিন সত্যি, কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।

তাই থাকতাম। কথা কিন্তু বলে যেত তুষ্টুই। আর চলত তার হাতের কাজ। একসময় প্রতিমার গায়ে পড়ত রঙের পোঁচ। দেবীর কাপড়, গয়নাগাটি সবই মাটির। তুষ্টুর রঙের তুলিতে হলুদবরণ দুর্গার পরনে লাল বেনারসি, সোনার গয়না। টানা চোখে রাগ আর আসল হাসি। অসুরের রং গাছসবুজ। আর সিংহ। আহা! কী তার বাহার। ভোলা যায় না তার রূপ।

পুজো হতো স্কুল বাড়িতে। সাধারণ মণ্ডপ। রঙিন কাগজের ঝালর আর শিকলি। আলো বলতে হ্যাজাক এবং ডে-লাইট। তাতেই মগ্ন সবাই। ও কদিন ওটাই ছিল ঠিকানা।

আনন্দের ভিয়েন বসত স্কুলবাড়ির সর্বজনীন ঘিরে। মহালয়া থেকেই নাটমন্দিরে যাত্রা হতো। তবে জমকালো আসরটা বসত একাদশীর দিন রাজবাড়ির দেউড়িতে। স্থানীয় শিল্পীরাই করত যাত্রা। ওদিন ঝলমলে পোশাক আর ডে-লাইটের আলোয় শিল্পীদের মনে হতো সত্যিকারের রাজা রানি।

নবমীর রাতকে যেন ‘কালরাত্রি’ মনে হতো

দুর্গাপদ ঘোষ

কেবল ‘বালানাং রোদনং বলম্’-এর মতো স্রেফ শিশুসুলভ আকুতি নাকি হিমগিরিনন্দিনী দেবী দুর্গার সঙ্গে সব বাঙ্গালির মা ও ছেলের মতো একাত্মতার অনুভূতি, বলতে পারবো না। তবে খুব ছোটোবেলা থেকেই অন্যান্যদের চেয়ে আমি বোধহয় একটু বেশি আবেগপ্রবণ। পুজোর আনন্দে যেমন একটু বেশি মাত্রায় আত্মহারা হয়ে যেতাম তেমনি নবমীর রাতটা ভোর হতেই মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে যেত নিরানন্দে, বিষাদে মন ভরে যেত। মা’কে বলতাম, মা, এই রাত কী চলে না গেলেই নয়? শুনে মায়ের মুখটা থমথমে হয়ে যেত। তারপর কথা ঘোরানোর জন্য হাসি-হাসি মুখ করে একটা অনেক পুরনো গানের কয়েক কলি গেয়ে মনটা হালকা করাবার চেষ্টা করতেন। কলিগুলো এক মুসলমান বালকের চোখে দেখা হিন্দুদের দুর্গাপ্রতিমার বিবরণ— ‘এক বিটি সিংঘের পরে, অসুরের মুণ্ডু ধরে বুকে মেরেছেন খোঁচা। কী দুগ্গো দ্যাখ্‌লাম চাচা।’ বাঙ্গলার এক বিশেষ অঞ্চলের লোকভাষায় এই ‘বিটি’ মানে বেটি, মানে কন্যা। ঠাকুমা-দিদিমার কাছে দৈত্য-দানোর কথা কথা শুনতে শুনতে অসুরের মতো দুরাত্মাদের বুকে বল্লমের খোঁচা মারার এবং কলিগুলো গাইবার সময় মায়ের মুদ্রাভঙ্গি দেখার মজায় তখনকার মতো নবমীর রাত চলে যাবার কথা ভুলে যেতাম। তবে তা ছিল সাময়িক।

আমাদের বাড়িতে বাক্সভরা ব্যাটারিতে চলা একটা রেডিয়ো ছিল। তাতে যেদিন থেকে ‘যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা আমার বড়ো কেঁদেছে’ বলে আগামনী গান কানে আসত সেদিন থেকেই পুজোর গন্ধ পেতাম। সেদিন থেকেই সকাল-বিকেল আমার ঠিকানা হয়ে দাঁড়াতো গ্রামের মোড়ল অন্নদা ঘোষের দেবদালান। সেখানে বাঁশের চটার (বাঁখারি) গায়ে খড়-বিচালি আর সুতলি দড়ি দিয়ে মূর্তি গড়া শুরু হতো। ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে দেখতাম। মূর্তিকারদের হাতে কী অপূর্ব কৌশলে কিম্ভূতকিমাকার থেকে ক্রমে ক্রমে মাটি, তারপর কাদাগোলার মসৃণ প্রলেপ, রং-তুলির সযত্ন ছোঁয়ায় একখানা চালার মধ্যেই কার্তিক-গণেশ, লক্ষ্মী-সরস্বতীকে নিয়ে গিরিরাজের বাড়ির মণ্ডপে এসে হাজির হতেন মা দুর্গা। রঙের প্রলেপের ওপর গর্জন তেল মেখে সবাই যেন চক্‌-চক্‌ করতেন। চেকনাই থেকে বাদ যেত না মূর্তিমান দানব মহিষাসুরও। কেবল মায়ের চোখদুটো আঁকার সময় সামনে একটা কাপড় বা চট টাঙিয়ে দেওয়া হত। ওঃ, তা দেখার কী কৌতূহলটাই যে ছিল। হাঁটু গেড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে কাপড়ের তলায় মাথা গলিয়ে টেরিয়ে দেখার চেষ্টা করতাম। একবার তো তা করতে গিয়ে মুখটাই মাটিতে থুবড়ে গিয়েছিল। শিল্পীরা কাপড়টা সরিয়ে নিতেই আমাদের ঘরে টাঙানো ক্যালেন্ডারের মা দুর্গা যেন জ্যান্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেন। মাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, গ্রামের মোড়ল কি দক্ষরাজা? নাহলে সব বছর তাঁর বাড়িতে মা দুর্গা আসেন কেন? আর একটা জিজ্ঞাসা তো থাকতই— বাবা টিকিট লাগানো নতুন জামাপ্যান্ট নিয়ে কবে বাড়ি আসবেন।

তখন গাজোয়ারি চাঁদা আদায় করে তারস্বরে চোঙাফুঁকে পাড়ায় পাড়ায় রেষারেষির পুজো ছিল না। ছিল না চোখ ধাঁধানো আলোর রোশনাই। কিন্তু বোঝা বোঝা ফুল-বেলপাতার সঙ্গে ছিল প্রাণঢালা নিষ্ঠা, গভীর ভক্তি আর অঞ্জলির সঙ্গে ছিল দেবীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া। ষষ্ঠী থেকে দশমীতে বিসর্জন পর্যন্ত ট্যাং-না-ন্যাটাং করে বাজত শুধু ঢাক আর কাঁসি। কিন্তু... ‘বলো দুর্গা মায় কী’ বলে পুকুরের জলে প্রতিমার বিসর্জন হতেই এক লহমায় দু’চোখের সব আনন্দ যেন দু’দুটো পুকুর হয়ে যেত। দেব-দালানে ফিরে এসে যখন সব ফাঁকা দেখতাম বুকটা একেবারে খাঁ-খাঁ করে উঠত। মায়েরা টানাটানি করেও বাড়ি নিয়ে যেতে হিমসিম খেয়ে যেতেন।

যে নতুন প্যান্ট-জামার গায়ে দোকানের নাম-দাম লেখা টিকিটের গায়ে ধুলোর কণাটুকুও লাগাতে দিতাম না কারণ যতক্ষণ টিকিট ততক্ষণই নতুন, সেই জামা-প্যান্ট শুদ্ধ গড়িয়ে পড়তাম ধুলোয় ভর্তি গ্রামের রাস্তায়। বারবার চোখ মুছিয়ে মায়েরা বলতেন, আমরা যেমন তোমাদের নিয়ে বাপের বাড়ি যাই, আবার ফিরে আসি মা দুর্গাও তেমনি বাপের বাড়ি এসেছিলেন। আজ চলে গেলেন। কিন্তু মন মানতো না। মনে মনে বলতাম, বললেই হলো! তোমাদের কি কেউ ওরকম করে জলে ফেলে দিত!

একটু বড়ো হয়ে যখন বিজয়ার মানে জানতে পারলাম যে দশমীর দিনটা হলো অশুভ দানবশক্তির প্রতীক মহিষাসুরকে বধ করে বিজয় লাভ করা তখন বিজয়ার জন্য খুব আনন্দ হতো, গর্বে বুক ফুলে যেত। কিন্তু তবু...। মনে মনে চাইতাম নবমীর রাতটা যেন ফিরে ফিরে না আসে। ওটাকে আমার কেমন যেন ‘কালরাত্রি’ মনে হতো। কারণ, ওই রাতটা চলে গেলে আমাদের আনন্দময়ী মা-ও যে চলে যাবেন।

ছেলেবেলার দুগ্গাপুজোটাকে ছুঁতে চাই, পাই না

সুজিত রায়

ছোটোবেলার দুগ্গাপুজো আর বড়োবেলার দুর্গাপুজোর মধ্যে একটা বিষয় সার্বজনিক। তা হলো অনুভূতি। অনুভূতিটা উৎসবের। অনুভূতিটা আনন্দের। অনুভূতিটা নতুন জামা-প্যান্টের আর জুতো-মোজার গন্ধ শোঁকার। অনুভূতিটা তিথি লগ্ন মেনে প্রহর জুড়ে ঢাকের বাদ্যি, কাঁসরের একটানা মধুর চিৎকার শোনার। অনুভূতিটা পাঁচমিশালি কাটা ফলের সঙ্গে দই-সন্দেশের স্বাদ নেওয়ার।

ছেলেবেলায় মানে আমরা যখন ফুলপ্যান্ট পরার যোগ্যতা অর্জন করিনি, হাফপ্যান্ট আর আদুর গায়ের সেই 'মোবাইল বিহীন, টেলিভিশন বিহীন, ইউটিউব, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, টেলিগ্রাম বিহীন এক অ-ডিজিটাল জগতের আদিমানব হিসেবে দিনযাপন করতাম, যখন ছোটোদের সিনেমা-থিয়েটার দেখা ছিল অন্যায়, যখন মেয়েদের শাড়িই ছিল পরিধান, তখন বুকের মধ্যে উথালপাথাল করে ওঠা দুগ্গাপুজোর অনুভূতিটা গুড়গুড় করে আওয়াজ তুলত পুজোর একমাস আগে থেকেই।

তখন থিমপুজোর কোনও 'আবিষ্কারক' জন্ম নেননি। তখন চন্দননগরের আলো মানেই দারুণ ব্যাপার। তখন পুজোর চাঁদা তুলতে পাড়ার কাকা-কাকিমা, জ্যাঠা-জেঠিমা, মেসো-মাসিমাদের সামনে হাজির হলেই, হাজির হয়ে যেত একথালা নারকেল নাড়ু। দু'টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকার আবদার মেটাতে তাঁদের কোনও খামতি ছিল না। এখনকার মতো তখন আমরা দেখিনি লাখ টাকার বিল কোনও দোকানে ছুঁড়ে দিয়ে মস্তানদাদারা নিদান দিয়ে গেলেন— বিকেলে পৌঁছে দেবেন টাকাটা— না এসব দেখিনি।

দুগ্গাপুজো মানে তখন পুজোর ছুটি। শিরশিরে হালকা ঠাণ্ডায় হালকা শিশির গায়ে মেখে শিউলির লুটোপুটি সবুজ ঘাসের ডগায়। তখন দুগ্গাপুজো মানে টানা ছ'দিন বইপত্র তোরঙ্গবন্দি করে ফেলা।

অনুভূতিটা আরও জোরদার হয়ে উঠত মহালয়ার ভোরে। সে আর এক অভিজ্ঞতা। দেখার সুযোগ ছিল না। শুধুই শোনা। দিদির কোলে বসে হালকা চাদরের ঘুমের মধ্যে একটু একটু শোনা— ইয়া দেবী সর্বভূতেষু...। বেশিটাই হালকা ঘুমে ভোর দেখার অভিজ্ঞতা। সেইদিন থেকেই বাঁধনছেঁড়া আনন্দ। দিন রাত একাকার করে পাড়ার প্যান্ডেলের বাঁশ থেকে বাঁশে দৌড়োদৌড়ি, ঝাঁপাঝাপি যেন সব অলিম্পিয়াডের যোদ্ধা। দাদারা প্যান্ডেল সাজাতো নিজেরাই। ইনটিরিয়র ডেকরেটর, আর্টিস্ট, সেসব দুরঅস্ত। দাদাদের ফাইফরমাস খাটতে কোনো আপত্তি ছিল না ছোটোদের। বরং সেটাই ছিল হিরোইজম। বুক ফুলিয়ে বলার মতো— 'এই দেখ, এটার এখানটা আমি রং করেছি' কিংবা 'ওটাতো আমিই লাগালাম ওখানে।'

দুগ্গাপুজো ছিল সেদিন গর্বের দিন যাপন। 'ও পাড়ার চেয়ে আমাদের পুজো অনেক ভালো' বলার মধ্যেও কোথাও যেন মিশে থাকত সেই অনুভূতি— 'ওদেরটা ভালো, তবে আমাদেরটা বেশি ভালো।'

না, না, পুরস্কার-টুরস্কার ছিল না। ছোটো ছোটো ইপি রেকর্ড বাজত গ্রামোফোনে। বাকিটা মা-দিদিদের বরণডালা, ফলপাকুড় সন্দেশ ভরা পুজোর ডালি আর সাঁঝবেলায় ধুনুচি নাচ—বাবাদের, দাদাদের।

বাকিটা ওই— ষষ্ঠী থেকে দশমী— রান্নাঘরে উঁকি দেওয়া। বাজার কী এল? মেনুটা কী আজ?

জিভে জল সরত। মনে ফুর্তির ঢেউ।

আজ আর দুগ্গাপুজো হয় না।

পুজোটাই হয় না। প্যান্ডেল হয়। আলোর ঝরনায় ভাসে গ্রাম, মফস্সল, শহর। ভিড়ের গুনতি হয়। তার ওপর গুনতি হয় কে কটা পেরাইজ পেল— মানে ট্রফি ঘরে এল কটা। তাই নিয়ে নাচানাচির ছবি টিভিতে।

ছেলেবেলার পুজোটাকে খুঁজি। পাই না। তবু অনুভূতিটা ফিরে ফিরে আসে। কেন কে জানে!

সেই শারদীয় পুলক আর এই শারদীয় প্রদাহ

শেখর সেনগুপ্ত

এক বছরের ওপর নির্ভেজাল ঘরবন্দি। গত বছরও করোনা ছিল। এ বছরও আছে। এর মধ্যে শেষ কবে হাসির ফোয়ারায় শামিল হতে পেরেছি, স্মৃতি হাতড়ে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তখনই মনে এল, আরে, গত বছর তো প্রায় এই সময়েই সদ্য 'আনন্দ পুরস্কার' প্রাপ্ত বান্ধব নলিনী বেরাকে সহযাত্রী করে কলকাতা থেকে চার চাকায় চেপে বর্ধমানের দিকে ছুটে ছিলাম সেখানকার বইমেলার উদ্বোধন করতে। আসা-যাওয়ার যাবতীয় ব্যয় উদ্যোক্তাদের। পরন্তু সময়ের মূল্য হিসেবে কিছু প্রাপ্তিযোগও। ওঁরা তাঁদের হৃদয় পেতে বরণ করেছেন; গাড়িতে যখন দু'জনের জন্য ঢুকিয়ে দিলেন এক জোড়া মিহিদানার প্যাকেট, আমরা তখন সমবেত হাসির ফোয়ারা তুলি এবং সেটাই শেষ। এরপর কোভিড-১৯ যেমন আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সংসারকে ত্রস্ত তটস্থ রেখেছে, তেমনি মন ক্রমশ তিক্ততায় ভরে গিয়েছে চারিদিকের প্রকটিত ইতরতায়। অথচ তখন তো আগমনীর ঝংকারে চতুর্দিক ঝংকৃত হবে বলে ছিল প্রত্যাশা। মুখে মাস্ক সেঁটে, দু'বার ভ্যাকসিন নিয়েও মানুষ তো তার মনুষ্যত্ব হারায়নি। পারিবারিক সম্পর্কগুলি একেবারে তলিয়ে যায়নি। অতিথি সৎকারেও সেই চিরন্তন তৃপ্তি অটুট। কিন্তু কালেভদ্রে বাড়ির বাইরে পা রাখলেই বিপরীত অনুভূতি। এলাকায় যে কয়েকটা ক্লাব বা সংগঠন রয়েছে, সেখানে তিলমাত্র সাংস্কৃতিক পরিবেশ নেই। সামনের দিকে তাকাই, ডান দিকে বা বাঁ দিকে তাকাই, বিরাট বিরাট ব্যানার— 'দিদি' হাসছেন। ক্লাব ঘরে অদ্ভুত সব স্বরগ্রামের ওঠা-নামা, স্খলিত স্বরের কুৎসিত প্রলাপ। এদেরকে ঐতিহ্য এবং সততা শেখাবার পন্থা কোথায়? ওরা অনেকেই তো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি ডিপ্লোমা এনেছে। কিন্তু কোথাও চাকরি পায়নি। না পাক, 'দিদি' পৌঁছে দিচ্ছেন কখনও টাকা, কখনও বা আমার অজানা অন্য কিছু। অর্থাৎ এদের কাছে দাবি বা অভিমান অপ্রয়োজনীয়। আমার আশঙ্কা বাড়ে। প্রাকৃতিক পরিবেশে যে সেই মাদকতা, শুধু বুক ভরে বাতাস টানলেই অনুভব করা যায়। অর্থাৎ মা আসছেন। করুণাময়ী দুর্গা। কিন্তু সত্যি কি মা আসবেন? মমতা ও প্রীতি— দুয়েরই বড়ো অভাব। জীবনযাপন আর জীবনধারণ দুইই বদলে যাচ্ছে। ঘরোয়া অন্তরঙ্গতা, শুভেচ্ছা, আলিঙ্গন— সর্বত্রই একটা ভীতির আবহ। নিজস্ব নির্জন কক্ষে ঢুকে কবিতার বইয়ে ডুব দেবার চেষ্টা করি। হঠাৎ বেজে ওঠে ডোর বেল। চকিত চিত্তে আমি দরজা খুলতেই দেখতে পেলাম পাড়ার ওই ক্লাবের জনা কয়েককে।

—কী ভাই?

—চাঁদা দিন। দুর্গাপূজার।

নাকে এসে লাগে অ্যালকহলের ঘ্রাণ। স্ত্রীকে ইশারায় সরে যেতে বলি। দু'শো টাকার একটি নোট বের করতেই যেন প্রবল আপত্তি, 'এতে হবে না। পাঁচ শো দিন।'

'অত কেন? মুখ্যমন্ত্রীই তো পঞ্চাশ হাজার দিচ্ছেন।'

'সে টাকা আমরা অন্য ব্যাপারে খরচ করব। আর তার হিসেব আমরা কাউকে দিতেও যাব না।'

ঠিক ঠিক। বিলকুল ঠিক। অহেতুক, অপ্রয়োজনীয় অভিমান আমার আপনার মানায় না। ওরা টাকা নিয়ে চলে গেল। গত বছর পুজোয় আমি এক দিনের জন্যও বাড়ির বাইরে পা রাখিনি।

এবারের পুজোয় কী হবে, জানি না। ব্যানারগুলি বৃষ্টিতে ভিজছে, আবার শুকিয়ে গেলে উড়ছেও পতপতিয়ে। দিদির হাসি। তবে মাত্র কাল রাতে আপনার অচেতনে আমি চলে গিয়েছিলাম সুদূর কৈশোরে। তখন ছিলাম দক্ষিণ কলকাতার হালতুর 'সরকার বাড়ি'তে। দেখলাম, ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত আমার ঠাকুমা খুব চেষ্টা করছেন আমাকে কোলে নিয়ে পুজোর মণ্ডপে গিয়ে দাঁড়াতে। সেখানে সকলে যেন একই পরিবারের সদস্য-সদস্যা। বারোয়ারি পুজো প্রকৃতই হয়ে উঠেছে সার্বজনীন। কোনও ব্যানার নেই, কোনও সংকীর্ণতা নেই; কিন্তু প্রীতি, শ্রদ্ধা ও স্নেহের চাঞ্চল্য অনস্বীকার্য। অখিল নিয়োগী অর্থাৎ 'যুগান্তর' পত্রিকার সেই 'স্বপন বুড়ো' এগিয়ে এসে আমার গাল টিপে দিয়ে বললেন, 'এই তুই আরও একটা ছড়া লিখে আমাকে দিয়ে যাস তো।'

আমি মা দুর্গার মুখের দিকে তাকালাম। মায়ের মুখে স্মিত হাসি। অর্থাৎ তিনি সম্মতি দিলেন।

‘ছিলাম ভলেন্টিয়ার হলাম সেবক, অসুর বধ-ই আসলি কাম’

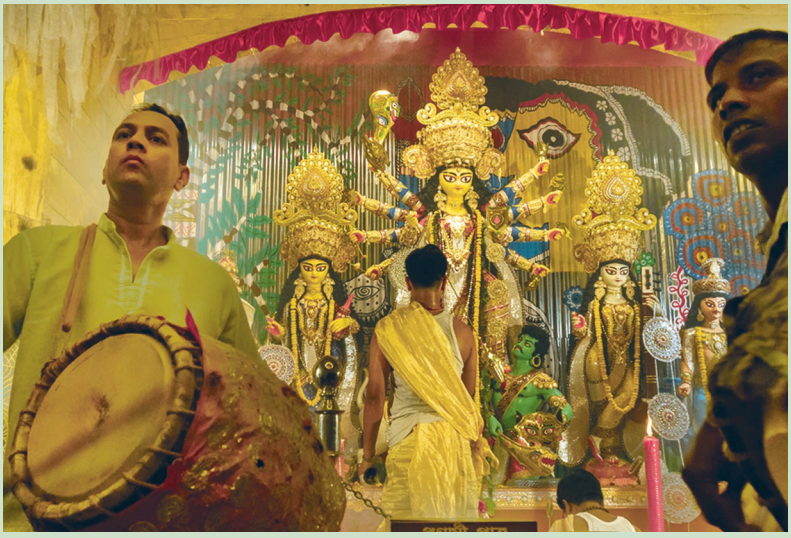

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

মাঝরাতে অসুর বধের মধ্যে দিয়েই শুরু হতো দুগ্গাপুজো। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। এখনো রেডিয়ো খুলে বসে যাই। দুগ্গাঠাকুর মধু খেয়ে অসুর বধ করে ফেললেই ঘুমিয়ে পড়ি। চণ্ডীপাঠ বোঝা বা উপলব্ধি করা আমার কম্ম নয়।

জীবনে অনেক অসুরের মুখোমুখি হয়েছি। কিছু লড়াই জিতেছি। বাকি হেরেছি। পরে জেনেছি তাদের মধ্যে কিছু অসুর পালটে গিয়েছে। কিছু ঝরে গিয়েছে। তবে হার-জিতের সে খেলা এখনও চলছে।

হলফ করে বলতে পারি একটা লড়াই আমি সমানে হেরে চলেছি। সেটা ‘মহিষাসুরের বিরুদ্ধে’। জীবনের যাত্রাপথ যত কমছে লড়াই তীব্র হচ্ছে।

মহিষাসুরমর্দিনীর ওরফে দুগ্গার কাছে তাই একটাই দাবি রেখেছি— ‘যে করে হোক এ লড়াইটা জিতিয়ে দাও। তাহলে বলব দুগ্গাঠাকুর স্বাগতম’। জিন্দাবাদ আমি বলি না।

অনেকে প্রশ্ন করবেন যার সঙ্গে লড়ছেন আর হারছেন সেই মহিষাসুরটি কে? বারবার হারছেন যখন লড়ছেন কেন? উত্তরটা গোলমেলে তাই দিলাম না। তাকে তুলে রাখলাম। আমার দুগ্গা পুজোর প্রধান আকর্ষণ ছিল ওস্তাদি করা। অর্থাৎ ভলেন্টিয়ারগিরি করা। যাকে বলে পাড়ার মধ্যে নিজের আইডেনটিটি তৈরি করা।

কীভাবে? বুকে ব্যাজ এঁটে পুজোর লাইন ম্যানেজ করে। বাঁকা ছপটি নিয়ে তিন সারির বাঁশের বেড়ার মাঝে দাঁড়িয়ে ‘ছেলে-মেয়ে’ আর ‘পুরুষ-নারী’ আলাদা করে। অর্থাৎ ‘ভাই-বাবারা’ এক লাইনে আর ‘মা-বোনেরা’ আলাদা সারিতে। এটা ঠিক অর্ধশতাব্দী আগের কথা। এখনকার উন্মুক্ত আর বৈজ্ঞানিক ভাবনার নিরিখে এই ‘জেন্ডার ভেদ’ অর্থহীন আর বোকা ব্যাপার।

খাওয়ার বা ঠাকুর দেখার আকর্ষণ আমার ছিল না। দঙ্গলে পড়ে তা করতাম। মাতব্বরিটাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তার বেশির ভাগটাই পাড়ার মধ্যেই চলত।

বয়স যত কমই হোক এই সময় একটা হাস্যকর ‘ক্ষাত্রতেজ’ আমাদের সকলকে জাপটে ধরত। আমি ব্যতিক্রম নই। পুরোটাই লোক দেখানো। ফলে সাজগোজ করে বান্ধবীদের ‘ইমপ্রেস করা বা আকর্ষিত হওয়ার’ প্রবল এলোমেলো ইচ্ছা জেগে উঠত। এখন বান্ধবী হয় না। সকলেই বন্ধু। জেন্ডার ভেদ উঠে গিয়েছে। ব্যাপারটা বিজ্ঞানসম্মত, গ্রহণযোগ্য আর অবশ্যই রুচিসম্মত। তার মানে এই নয় যে আগেরটা রুচিহীন। আমার মতে প্রাচীন। একটা অচলায়তন যা ভেঙে গিয়েছে।

দশমীতে দুগ্গাঠাকুর কৈলাসে তার বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার পর বা গঙ্গাজলে পড়ে যাওয়ার পরেও আমার সেই আবোলতাবোল ভাবনা আর ইচ্ছার রেশ ফুরতো না।

স্বাভাবিক ভাবেই কিছুদিন থাকার পর আপনা থেকেই তার তাল কেটে যেত। না কাটলে মারাত্মক পরিণতি হতো। পুজোয় যাঁরা আমাকে সাজিয়ে গুজিয়ে ‘তোকে কী সুন্দর লাগছে’ বলে রাস্তায় নামাত তাঁরাই লাঠি হাতে পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। বলতেন ‘ছেলেটা একবারে গোল্লায় গেছে। জীবনে কিসসু করতে পারবে না।’

ছোটো থেকে অনেক বাড়িতে একটা ‘বোকা বুলি’ শেখানো হয়— ‘১০-এর মধ্যে ১ হয়ে উঠতে হবে। বংশের মান রক্ষা করতে হবে। ভাবটা এমন যেন আমার নাকি ৯ জন বন্ধু ‘ফালতু’-‘ফেলনা’। তাদের কোনও দাম নেই। অথচ তারা আমার বন্ধু।

কী আশ্চর্য ভাবুন তো!

দুগ্গা ঠাকুর অসুর মেরেছে। তাই উৎসব হচ্ছে। তার সঙ্গে ‘আমার ইজ্জত কী সওয়াল।

বংশমর্যাদা। ১০-এর ১ হয়ে ওঠা এসব কী করে মেশে?

আর এসব মাথায় নিয়ে ৪ দিনের উচ্ছৃঙ্খল খাওয়াদাওয়া করা, প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘোরা, বান্ধবীদের আলতো ছোঁয়া পেয়ে নিজেকে উত্তমকুমার, অমিতাভ বচ্চন, গ্রেগরি পেক বা ক্লিন্ট ইসটউড মনে করার এক উদ্ভট কল্পরাজ্য তৈরি হতো। সে কল্পনা থেকে অব্যাহতি পেতে বেশ কিছুটা সময় লাগত।

আমার মানস বান্ধবী আমার অন্য বন্ধুকে বেশি গুরুত্ব বা পাত্তা দিচ্ছে মনে করে মাঝে মাঝে দেবদাসও হয়ে যেতাম। এ ব্যাপারে আমরা সব বন্ধু এক পথের পথিক। শুধু বান্ধবীদের মনের কথা কোনও দিন আমরা জানতে পারিনি। ক্যাবলার মতন অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে গিয়েছি।

এখন আর কেউ আমাকে গুরুত্ব দিয়ে ভলেন্টিয়ার হতে ডাকে না। তাই এখন আমি সেলফ-স্টাইল বা নিজের মতন ‘সেবক’ হয়েছি। কেউ মানুক বা না মানুক।

কার সেবক? অবশ্যই দুর্গাদুর্গতিনাশিনীর। তবে তখন দুগ্গা ঠাকুরকে যা বলিনি এখন তা বলেই শেষ করছি—

‘মাতঃ দুর্গে! সিংহবাহিনী সর্ব্বশক্তিদায়িনী মাতঃ শিবপ্রিয়ে। তোমার শক্তংশ্যজাত আমরা বঙ্গদেশের যুবকগণ তোমার মন্দিরে আসীন, প্রার্থনা করিতেছি— শুন মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও।।

(শ্রীঅরবিন্দ, দুর্গা-স্তোত্র)

পূজার দিনগুলির হর্ষ ও বিষাদময় স্মৃতি আজও অমলিন

গোপাল চক্রবর্তী

আমার জন্ম পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামে হলেও ছেলেবেলার অনেক পূজা কেটেছে কলকাতায়। কারণ চট্টগ্রাম থেকে পুজোর আগে প্রায় প্রতি বছর মায়ের সঙ্গে কলকাতায় আসতাম। তখন কলকাতার পূজার এত জৌলুস ছিল না। পাড়ায় পাড়ায় তখনো পুজো হতো। অধিকাংশ জায়গায় দেখতাম পাড়ার ছেলেরা মণ্ডপ বানাচ্ছে, বড়োরা তদারকি করছেন। অনেক দূরের পোস্ট থেকে তার টেনে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানো হচ্ছে। তার মধ্যে একটা আলাদা আনন্দ ছিল। আমার পুজোর সময় কলকাতায় আসায় বাধা পড়ল ১৯৬৫ সালে। সেবার ৬ সেপ্টেম্বর থেকে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলো। অক্টোবরে পুজো, পাসপোর্ট, ভিসা বন্ধ, সেবার পুজো দেশের বাড়িতেই কাটল। পুজো হলো নমো নমো করে।

আমাদের গ্রামে তখনো ইলেকট্রিক আসেনি, হ্যাজাক লাইট জ্বালানো হতো পুজোর সময়। ঢাকিরা থাকত। মাইকের প্রচলন তখন গ্রামের দিকে হয়নি। তখনকার পুজোয় ভক্তিনিষ্ঠার কোনো অভাব ছিল না।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত পাসপোর্ট ভিসা আর চালু হয়নি। কাজেই কলকাতায় আসা বন্ধ। আমাদের পাশের বাড়িতে দুর্গাপূজা হতো। বাইরের কারিগরেরা ঠাকুর গড়তে আসত। ওদের বলা হতো ঢাকাইয়া কারিগর, আসলে ওরা ফরিদপুর জেলার লোক। সেই ছোটোবেলায় ওদের কাছে ঠাকুর গড়া শিখেছিলাম। আমাদের গ্রামে সেবার প্রথম বারোয়ারি পুজো শুরু হলো। আমার বয়স তখন এগারো কী বারো। সেই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম। এক আর্টিস্ট দাদার সঙ্গে মণ্ডপ সজ্জার দায়িত্ব পেলাম। সেবার প্রথম মাইক এলো, তখন এইচ.এম.ভি'র রেকর্ড গ্রামোফোনে বাজানো হতো। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠের রেকর্ড ছিল পুজোমণ্ডপে খুব জনপ্রিয়। আরও একটা জনপ্রিয় রেকর্ড ছিল নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সিরাজদ্দৌলা। আর পূজামণ্ডপে জগন্ময় মিত্রের গানের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা ছিল। আজও কানে বাজে জগন্ময় মিত্রের সেই চিঠির গান— মনে পড়ে তাই, চিঠি লিখে যাই কথা আর সুরে সুরে...।

পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন। নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেল শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ। কিন্তু পাকিস্তানি সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করলো না। অনেক গড়িমসির পর ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর গভীর রাতে পাকবাহিনী শুরু করল বাঙ্গালি নিধন যজ্ঞ। শুরু হলো পাকবাহিনীর সঙ্গে বাঙ্গালি সেনাদের এক অসম যুদ্ধ। কয়েকদিনের মধ্যে বাঙ্গালি সেনাদের প্রতিরোধ ভেঙে গেল। শুরু হলো পাকবাহিনীর নৃশংস অত্যাচার। বিশেষ লক্ষ্য হিন্দুরা। হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যা, হিন্দুদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, মেয়েদের ধর্ষণ, অপহরণ আর অবাধ লুঠপাট। এই আবহেই এল দুর্গাপূজা। অষ্টমীর দিন সকালে আমাদের গ্রামে ঢুকল পাকবাহিনী আর স্থানীয় রাজাকার বাহিনীর লুঠেরা। সেদিন আমিও প্রায় তাদের সামনে পড়ে গিয়েও কোনোরকমে পালিয়ে বেঁচে ছিলাম। সেদিন খানসেনা আমাদের গ্রাম থেকে পনেরো জনকে ধরে নিয়ে গিয়ে গ্রামের পাশে খালের ধারে গুলি করে মেরেছিল। গ্রামের অমূল্য সেন সপরিবারে অষ্টমী পূজায় বসেছিল পুরোহিতের সঙ্গে তাদেরকেও তুলে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মেরেছিল।

পরদিন সব মৃতদেহ খালের জলে ভেসে উঠেছিল। সেদিনের সেই ভয়াবহতার কথা মনে হলে আজও শরীর কণ্টকিত হয়। সুদীর্ঘ নয় মাসের সংগ্রামের পর ভারতের সহায়তায় বাংলাদেশ স্বাধীন হলো।

১৯৭২ সালে, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দুর্গাপূজা। ভারতের সাহায্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা গৃহীত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল বলে খ্যাত শেখ মুজিবুর রহমান দেশের প্রধানমন্ত্রী। যদিও তিনি কুখ্যাত সুরাবর্দির প্রধান শাকরেদ ছিলেন। সেবার পূজায় হিন্দুরা বিপুল উৎসাহে মেতে উঠেছিল কী শহরে কী গ্রামে। সপ্তমীর দিন ভালোভাবেই কাটল, কিন্তু অষ্টমীর সন্ধ্যায় এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। একই সময়ে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রায় সবকটি পূজামণ্ডপ আক্রান্ত হলো মৌলবাদীদের হাতে। কিছু জায়গায় পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল নিষ্ক্রিয়। কোথাও কোথাও পূজা কমিটিগুলি প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। আমরাও খড়্গ, বাঁশ, লাঠি নিয়ে প্রস্তুত ছিলাম। আমাদের মণ্ডপ আক্রান্ত হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশ নিয়ে হিন্দুরা যে স্বপ্ন দেখেছিল তা ধূলিসাৎ হলো। তখন আমি স্কুলের গণ্ডী পেরোয়নি। তবে সেইসব দিনের স্মৃতি আজও স্মৃতিতে অমলিন। কতকাল দেশ ছেড়েছি, আজকের পুজোর এত জাঁকজমক, আড়ম্বরের মধ্যেও মনে পড়ে সেই হারিয়ে যাওয়া পুজোরদিনের হর্ষ ও বিষাদময় স্মৃতি।

নাপিত ঝোলা থেকে আয়না বের করে ছোটোদের মুখ দেখিয়ে যেতেন

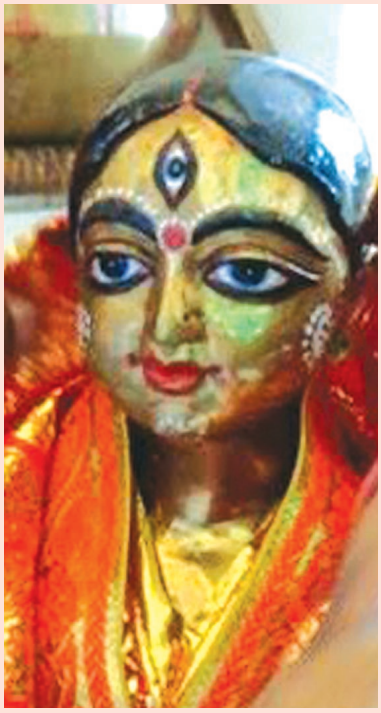

করুণা প্রকাশ

মনে পড়ে তখন ছোটোবেলায় পুজোর আগে থেকেই হালকা শীত শীত ভাব এসে যেত। সকালে ঘাসে শিশির ভালো মতোই দেখা যেত। আমাদের গ্রামে পুজো মণ্ডপেই প্রতিমা তৈরি হতো। অন্যত্র অধিকাংশ স্থানেও তাই। অনেকদিন ধরে প্রতিমা গড়ার কাজ চলত। আমরা মাঝে মধ্যে গিয়ে দেখে আসতাম কতটা তৈরি হলো আর কতটা বাকি। আমরা এটা খুব উপভোগ করতাম ছোটো বেলার বন্ধুদের, ভাই-বোনেদের সঙ্গে।

পুজোর আগে চারিদিকে এক সাজো সাজো রব পড়ে যেত। প্রকৃতিতেও সেই রকমই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেত। ধান খেতগুলো যেন আরও বেশি সবুজ আর সুন্দর হয়ে উঠত। পুকুরগুলি জলে পরিপূর্ণ থাকত। গাছপালাগুলোতে সবুজের সমাহার। শিউলি, টগর-সহ অন্য ফুল গাছ ফুলে পরিপূর্ণ। সেই সব ফুলের সুগন্ধে চারিদিক সুগন্ধিত থাকত।

তখনকার মতো পুজো এখন আর দেখি না। এখনকার মতো সব কাজ পেশাদারি লোকেদের দিয়ে করানো হতো না। প্রায় সব কাজই গ্রামের সকলে মিলেমিশে করত। পুজো মণ্ডপ, সাজসজ্জা সবই। আলোকসজ্জা তো তেমন কিছু ছিল না। রাতে হ্যাজাক জ্বালানো হতো কয়েকটি, তার আলোতেই পুজো হতো। পুজোতে বাজিও ফাটানো হতো। রঙিন কাগজ বা কাপড় পুজো মণ্ডপ সাজাতো বড়োরা। মণ্ডপের চারিদিক গোবরজল দিয়ে লেপা হতো। কলাগাছ ও অন্য গাছের পাতা দিয়েও সাজানো হতো। মাইক বাজাতো তবে ২৪ ঘণ্টা তারস্বরে চিৎকার করে নয়। ঢাক, ঢোল, কাঁসর ঘণ্টা বাজত।

পুজোর নির্ঘণ্ট মেনে শাস্ত্রীয় বিধি মেনে পুরোহিতরা নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পুজো করতেন। পুজোর বিভিন্ন কাজে বিশেষ করে প্রসাদ তৈরি যজ্ঞ ইত্যাদি কাজে বাড়ির মায়েরা পালাক্রমে সেই সব কাজ করতেন।

আর একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয় ছিল, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকত। গ্রামের নাপিত পুজোর সময় পুরোহিতদের অনেক সামগ্রী জোগাড় করে এনে দিতেন যেমন বেলপাতা, ফুল, হবন সামগ্রী ইত্যাদি। তাঁতিরা প্রয়োজনীয় গামছা, ধুতি, শাড়ি ইত্যাদি নতুন বস্ত্র তৈরি করে দিত কুমোররা মাটির বাসনপত্র দিত। কৃষকেরা দিত শাকসবজি, ফল অন্য খাদ্যশস্য। তখন চাঁদা তোলার প্রচলন ছিল না, কেউ দিত পুরোহিতদের দক্ষিণা, কেউ দিত ঢাকিদের পয়সা। এভাবে সব কাজ চলত।

কৃষকেরা পুজো মণ্ডপে বলদদুটিকে বেশ সুন্দর সাজিয়ে শিঙে রং করে দেবী দর্শন করাতে আসতেন। অনেকে অনেকরকম ভাবে নিজেদের বলদকে সাজিয়ে নিয়ে আসতেন। সে এক দৃশ্য দেখার মতো। কখনও কখনও সেই বলদের আবার দৌড় প্রতিযোগিতাও হতো।

আর এক বিশেষ প্রথা ছিল আমাদের গ্রামে ও আশেপাশের গ্রামেও। বিজয়াদশমীর দিন ভোরবেলা থেকে একে অন্যের বাড়িতে বাড়িতে তাদের তৈরি সামগ্রী দিয়ে যেত। যেমন তাঁতি তার তৈরি কাপড় বাড়ি বাড়ি দিয়ে যেত। কুমোর ঠিক সেই রকমই। জেলে মাছ ধরে বাড়ি বাড়ি দিয়ে চলে যেত। গ্রামের নাপিত প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে চুল-দাড়ি সেদিন না কাটলেও বাড়ির বড়োদের বা ছোটোদের তার ঝোলা থেকে আয়না বের করে মুখ দেখিয়ে দিয়ে যেত। এই ব্যাপারটা আমরা খুব উপভোগ করতাম। আমরা অপেক্ষায় থাকতাম যে নাপিত কখন এসে পৌঁছায়।

বিজয়াদশমীর দিন বিকেলে মেলা বসত জাঁকিয়ে। আমরা নতুন জামাপ্যান্ট পরে মেলায় যেতাম। তখন আমরা হাফ প্যান্ট আর হাফ শার্ট বা ফুল শার্ট পরি। এখনকার মতো ফুলপ্যান্ট পরার প্রচলন ছোটোদের জন্য ছিল না।

সকালে যারা বাড়ি বাড়ি নিজেদের তৈরি জিনিস দিয়ে গিয়েছিল তারা বিকেলে একের পর এক এসে বাড়ি বাড়ি কিছু অর্থ বা কিছু সামগ্রী সংগ্রহ করে নিয়ে যেত। সে এক আনন্দের পরিবেশ। অনেক সময় তারা কিছু বিশেষ আবদারও করত।

বিজয়াদশমীর মেলায় হিন্দু ছাড়া স্থানীয় মুসলমানরাও পরিবার-সহ মেলায় আসত। বছরের এই মেলার জন্য হিন্দুদের মতো তারাও অপেক্ষা করে থাকত।

বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের পর থেকে শুরু হয়ে যেত বাড়ি বাড়ি গিয়ে বড়োদের বিজয়ার প্রণাম করার পালা। তার সঙ্গে প্রত্যেক বাড়িতে সেই বাড়ির তৈরি খাবার খাওয়ার পালা। নারকেল নাড়ু, মুড়ির নাড়ু, চিড়ের নাড়ু, মুড়কি বাড়িতে বাড়িতে পুজো উপলক্ষ্যে তৈরি করা হতো। আর তা দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন হতো। বিভিন্ন ধরনের শুকনো মিষ্টিও বাড়িতে এসময় তৈরি করে রাখা হতো যেমন মতিচুড়ের নাড়ু ইত্যাদি। এই বিজয়ার প্রণাম এবং খাওয়ার পালা বেশ কদিন ধরেই চলত। এখন মনে হয় ছোটোবেলাটা যদি আবার ফিরে আসে।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে টাইমস স্কোয়ারে হরিনাম সংকীর্তন

বাংলাদেশে নিরন্তর হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে গত ৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে 'যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু কোয়ালিশন'-এর উদ্যোগে হরিনাম সংকীর্তন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু কোয়ালিশন অমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অধিকার আদায়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও আন্দোলন করে আসছে। এবারেও শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদ সভা সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

হরিনাম সংকীর্তন ও প্রতিবাদ সমাবেশে বেশ কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন ও মন্দির কর্তৃপক্ষ অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ফ্রেন্ডস অব বিজেপি, মহামায়া মন্দির, শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ, শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ(ব্রঙ্কস), রাধামাধব মন্দির, গৌরনিতাই মন্দির, ব্রঙ্কস পূজা কমিটি, নিউইয়র্ক বুদ্ধিস্ট টেম্পল, পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, গ্লোবাল হিন্দু কোয়ালিশন ইত্যাদি।

সমাবেশে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন শীতাংশু গুহ, নিতাই বাগচী, গোবিন্দ বানিয়া, দীনেশ মজুমদার, প্রকাশ গুপ্ত, দীপক দাস, সুকান্ত দাস টুটুল, রণবীর বড়ুয়া, ডাঃ প্রভাত দাস, আশিস ভৌমিক, রমেশ নাথ, দ্বিজেন ভট্টাচার্য, গীতাপাঠক দেবাশিস দেবনাথ, সবিতা দাস, সুনীল সিংহ, সুশীল সাহা, প্রদীপ কুণ্ডু, প্রদীপ ভট্টাচার্য, বিষ্ণু গোপ, মহামায়া মন্দিরের প্রেসিডেন্ট রঞ্জিত সাহা, রুমা ভৌমিক, সাবিত্রী সাহা, কুমার বাবুল সাহা, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, তরুণ সাহা, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, তপন সেন প্রমুখ।

সমাবেশে উপস্থিত জনতা 'সেভ হিন্দুজ ইন বাংলাদেশ', ' স্টপ টেম্পল অ্যান্ড ডেইটি ডেস্ট্রাকসন, ' স্টপ ফোর্সফুল কনভারসান টু ইসলাম' ইত্যাদি প্ল্যাকার্ড বহন করেন। বিভিন্ন বক্তা খণ্ড খণ্ড সাক্ষাৎকারে সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস, মন্দির ভাঙচুর, ঘরবাড়িতে হামলা, ডিজিটাল অ্যাক্টের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের অনবরত নির্যাতন বন্ধ করতে হবে এবং ঝুমন দাস-সহ ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে আটক সকলকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। সমাবেশ থেকে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস বন্ধে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া মেনে নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

লাটাগুড়িতে সেবা ভারতী ও সীমান্ত চেতনা মঞ্চের সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন

গত ৪ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ি জেলার লাটাগুড়িতে সেবা ভারতী ও সীমান্ত চেতনা মঞ্চের যৌথ উদ্যোগে একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন উত্তরবঙ্গ সহ প্রান্ত সঙ্ঘচালক কেপি যাদব। উপস্থিত ছিলেন নাগাল্যান্ডের সেবা ভারতীর সভাপতি ডাঃ শঙ্করদেব রায়, উত্তরবঙ্গ সেবা ভারতীর সাধারণ সম্পাদক সুনীল সাহা, উত্তরবঙ্গ সীমান্ত চেতনা মঞ্চের সংগঠন সম্পাদক গণেশ পাল।

দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন একজন প্রশিক্ষণার্থী।ডাঃ শঙ্করদেব রায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিয়মাবলী এবং প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। গণেশ পাল তাঁর বক্তব্যে এই এলাকার যুবকদের জন্য এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গুরুত্বের কথা ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মহালয়া

বিশ্ব-মঙ্গলের আন্তরিক আকুতি

নন্দলাল ভট্টাচার্য

ভারত-ধর্মের বৈশিষ্ট্য— মানুষের প্রতি শর্তহীন ভালোবাসা। এই ধর্মে পরমার্থিক একটা লক্ষ্য অবশ্যই থাকে। কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর ক্ষেত্রেও মানুষ কখনও উপেক্ষিত থাকেনি। বাঁচা এবং মরা কোনোটাই কিন্তু মানুষকে বাদ দিয়ে নয়। মানুষের থেকে দূরে গিয়েও নয়। সমষ্টির কল্যাণ ও সমৃদ্ধিই ব্যষ্টির সকল সুখের কারণ। এমন একটা বোধই অতি সক্রিয় ভারত ধর্মের প্রতিটি অনুষ্ঠান, আচার-উৎসব এবং পালাপার্বণের সঙ্গে। এরই মধ্যে মহালয়া যেন সকলের মধ্যে লীন হওয়ার এক পবিত্র অনুষ্ঠান।

এই মাটির পৃথিবী ও আকাশ— দুয়ের প্রতিই মানুষের সীমাহীন কৌতূহল। কোনো একটিকে নিয়ে তুষ্ট নয় মানুষ। মাটির গভীরে শিকড়ের সন্ধানে মানুষ ছুটে যায় আকুল আগ্রহে। আবার মাটিতে দাঁড়িয়েও আকাশের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দেয় সে। মানুষের বিশ্বাস, একদিন যাঁরা ছিলেন অতি আপনজন, এই মর্ত্যভূমে বুনেছিলেন আগামীর বীজ— তাঁরা রয়েছেন ওই দূর আকশে অথবা তারও পরে যে মহাকাশ— যে মহালোক— সেইখানে। ঊর্ধ্বদৃষ্টি মানুষ সেখানেই খোঁজে তাদের। প্রতিনিয়তই চলে মানুষের সেই স্মরণ এবং মনন— তবুও বছরের বিশেষ কোনো দিনে অথবা সময়কালে তাঁদের কথাই শুধু ভাবনায় থাকে। শ্রদ্ধায়-কৃতজ্ঞতায় সেই স্মরণের মুহূর্ত হয়ে ওঠে অবিস্মরণীয়। ভারতীয়দের কাছে এমনই এক বিশেষ দিন--- মহালয়া। পিতৃ পক্ষের সমাপ্তি এবং দেবীপক্ষের আগমনীতে বেজে ওঠে যে সুর— সেই সুরে সুরে গীতিময় মহালয়া একই সঙ্গে বিষাদ ও আনন্দের এক মহা সন্ধিক্ষণ। বিষাদ— যাঁরা ছিলেন একদিন এই মরলোকে বড়ো আপনজন— তাঁদের কাছে না পাওয়ার বা অদর্শনের বেদনায়। আনন্দ, —তাঁরা কাছে না থাকলেও শিরা-উপশিরায় বহমান তাঁদেরই রক্তের উষ্ণ উপলব্ধিতে। সেই সঙ্গে অমরার কোনো এক প্রান্ত থেকে ভেসে আসা মঙ্গলশঙ্খের মহানির্ঘোষে মায়ের আগমনবার্তা কর্ণকুহরে প্রবেশের কারণে। হারানোর মধ্যেও প্রাপ্তির এক অনুভবেই আশ্বিনের এই মহালয়া আলোড়িত করে ভারত-হৃদয়কে এক অনাস্বাদিত পুলকের শিহরণে।

মহালয়া নিছক একটি শব্দ নয়। নানা কারণেই মহালয়া ভারতীয় জীবনে একটি বিশেষ অর্থবহ দ্যোতনা। আভিধানিক অর্থে এটি হলো মহান আলয় বা পরমাত্মা। যাতে আত্যন্তিক বা অবিচ্ছিন্ন লয় হয়— সেটাই হলো মহালয়া। মহা ও আলয়-এর মেলবন্ধনে গঠিত মহালয়ার অন্তরলোকে রণিত মহামিলনের মহামন্ত্র। যার প্রতিটি অঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগের কথা, তার নামের মধ্যেও যে ক্রিয়াশীল সম্প্রীতি ও সংযোগ— এ এক বিস্ময়, তাতে নেই কোনো সন্দেহ।

সংস্কৃত মহালয় থেকে মহালয়া। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ মহতে অর্থাৎ পরব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া। মহা ও লয় শব্দযোগে গঠিত সৌর আশ্বিনের এই অমাবস্যাটি তাই পুণ্য তিথি।

অভিধানে মহালয়ার রয়েছে বহু অর্থ। যেমন--- মন্দির, আশ্রয়, মহান, আলয়, তীর্থক্ষেত্র, ব্রহ্মলোক, মহালয়া বা আদিমাতা-আদ্যাশক্তি, পবিত্র বৃক্ষ, এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কৃষ্ণপক্ষ, চান্দ্র ভাদ্রমাসের পিতৃবান্ধব তিথি, দেবতা বিশেষ, মহাপ্রলয় ইত্যাদি। মনুস্মৃতিতে মহালয় হলো শ্রাদ্ধকাল। পদ্ম ও ব্রহ্ম পুরাণে মহালয়া একটি তীর্থক্ষেত্র। আবার স্কন্দ পুরাণ মতে মহালয়ার অর্থ— ধনুষ্কোটির মহিমা এবং অসৎ দুর্নীতি ইত্যাদির বিনাশ। অনাচারের বিলোপ ঘটিয়ে ধর্ম বা আচারের প্রতিষ্ঠা।

মহালয় থেকে মহালয়ার উৎপত্তি, এমন কথাই আছে গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নর শব্দসার অভিধানেও। বলা হয়েছে আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ বা অপরপক্ষ হলো মহালয়— যা পিতৃপুরুষের

উৎসবের আধার। একসময় দিনটির আবশ্যিক কৃত্য ছিল পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধ। এখন শুধু তর্পণ দিয়েই সারা হয় কাজ। প্রসঙ্গত, পিতৃহীন গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্যতম তর্পণ বা জলাঞ্জলি দান। তাই এর অন্য নাম পিতৃযজ্ঞ। দুই হাতের যুক্ত আধারে বা কুশিতে জল ভরে তা নিবেদন করা হয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি দেবতা, সনক-সনন্দ প্রমুখ বিশিষ্ট পুরুষ, মরীচি ইত্যাদি ঋষি, চতুর্দশ যম, পিতৃ-মাতৃকুলের অন্তত তিন পুরুষ ও ত্রিভুবনের উদ্দেশে।

সব মিলিয়ে মহালয়ার অনুষঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেকগুলি পর্ব। প্রাথমিক বা মুখ্য উদ্দেশ্য প্রয়াত পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে গঙ্গা বা অন্য কোনো পুণ্যতোয়া বা পবিত্র জলাশয়ে জল ও তিল নিবেদন। এরই নাম তর্পণ, তপর্ণের সঙ্গে কেউ কেউ শ্রাদ্ধও করে থাকেন। পক্ষকাল ধরে চলে তর্পণ। আশ্বিনের কৃষ্ণাপ্রতিপদ থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত। এখন বেশিরভাগ মানুষই মহলায়ার দিন তর্পণ করে বহমান রেখেছেন এই প্রাচীন ধর্মীয় ধারাকে।

এক অর্থে তর্পণ এক অপূর্ব অনুষ্ঠান। বাহ্যত এটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কিন্তু গঙ্গা বা কোনো নদী বা জলাশয়ে যখন বহু মানুষ সমবেত হয়ে নিজের নিজের কর্তব্যটি সমাধা করেন তখন তা একটি সর্বজনীন অনুষ্ঠান বা মহামিলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে বিচ্ছিন্ন হয়েও একই মন্ত্র, একই উদ্দেশ্যে তর্পণ বা সতিল উদকাঞ্জলি দান কেমন যেন একই সুরে বেজে ওঠা শতযন্ত্রের ঝংকারে মন্দ্রিত ঐকতান বা বৃন্দবাদনের মূর্চ্ছনায় পরিণত হয়।

মহালয়ার তর্পণের সময় গঙ্গা বা নদীঘাটে উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন সব বর্ণের মানুষ মুহূর্তের জন্য হলেও বসনে-ভূষণে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তর্পণ মন্ত্রে যখন আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত চরাচরের সকলে তৃপ্তি ও শান্তির জন্য সলিলাঞ্জলি দেওয়া হয়— তখন সৃষ্টি হয় সত্যিই এক মহামিলনের কেন্দ্র— ভারততীর্থের।

মহালয়ায় তর্পণ বা শ্রাদ্ধ করা হয় তিন পুরুষের। কারণ হিসেবে শাস্ত্রের নিদান, এই মরভূমি এবং অমরাভূমির মধ্যস্থলে রয়েছে পিতৃলোক। পিতৃলোকে অবস্থান করেন তিন পুরুষ। চতুর্থ পুরুষ মারা গেলেই পিতৃলোকের প্রথম পুরুষকে নিয়ে যাওয়া হয় স্বর্গে পরমপিতার সঙ্গে মহামিলনের জন্য। তাই পিতৃলোকে সবসময়ই অবস্থান করেন তিন পুরুষ। তাঁদের উদ্দেশেই করা হয় তর্পণ।

পুরাণমতে, পিতৃপক্ষের সময় পিতৃপুরুষ পিতৃলোক থেকে নেমে আসেন পৃথিবীতে তাঁদের প্রিয় আপনজনদের কাছে। কেমন আছে উত্তরপুরুষরা তা দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জল দান করা হলে তাঁরা তৃপ্ত হন। তৃপ্ত পিতৃপুরুষরা আশীর্বাদ করেন সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য, কুল বর্ধনের জন্য।

পিতৃপক্ষে তর্পণ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি করার উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয় মহাভারতের কর্ণের কথা। দাতাকর্ণ সব সময় সকলকে দিতেন সোনারুপো ও নানা রত্ন, কোনো সময়েই কাউকে দেননি অন্ন। মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে ক্ষুধার অন্ন প্রার্থনা করলে তিনি সুসজ্জিত থালায় তাঁকে দেন সোনা রুপো ও নানা রত্ন। তাতে কোনও খাবার না থাকায় ক্ষুধায় কাতর কর্ণ অন্ন প্রার্থনা করলে দেবরাজ বলেন, তুমি চিরকাল শুধু এসবই দিয়েছো সকলকে। কখনও নিবেদন করোনি অন্ন। তাই তোমাকে তো অন্ন দিতে পারি না। সেটা যে নেই তোমার জন্যে।

কর্ণ বলেন, একথা তিনি জানতেন না। কেউ তাঁকে একথা বলেওনি। সেকারণেই এই ভুলটি করেছেন তিনি। এ ভুল সংশোধনের জন্য তাঁকে তাই আবার পৃথিবীতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে সংশোধন করবেন তিনি নিজের ত্রুটি। তখন দেবরাজ তাঁকে পিতৃপক্ষের এই পনেরো দিনের জন্য মর্ত্যে যাওয়ার অনুমতি দেন। কর্ণও পৃথিবীতে ফিরে পনেরো দিন ধরে অন্ন ও জলদান করেন। তারপর স্বর্গে ফিরে পান আহার্য। আর তার পর থেকে প্রবর্তিত হয় পিতৃপক্ষে শ্রাদ্ধ ও তর্পণের।

অন্য কাহিনি, উত্তরপুরুষদের শ্রদ্ধা গ্রহণ ও তাদের আশীর্বাদ করার জন্য বিষ্ণু এদিন মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মাকে পৃথিবীতে যাওয়ার অনুমতি দেন।

আরেক কাহিনি, দেশ জয়ের এক প্রচণ্ড সংঘর্ষে দু' পক্ষেরই বহুজন নিহত হয়। সেই যুদ্ধ শেষ হয় আশ্বিনের অমাবস্যায়। দু'পক্ষেরই বহুজন প্রাণ হারার এ যুদ্ধে। তাদের আত্মার শান্তি কামনায় দু' পক্ষই এদিন তর্পণ করে। মহালয়ার তর্পণের উৎস এই ঘটনা বলে ধারণা অনেকের।

মহালয়া পিতৃপক্ষের শেষ দিন। এর পরই দেবীপক্ষের সূচনা। এই দেবীপক্ষে বিশ্বমাতা দুর্গার পুজোরও প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। দেবী এই মহালয়ার দিনই পুত্র-কন্যা কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীকে নিয়ে রওনা হন পিতৃগৃহে যাওয়ার জন্য। কৈলাস থেকে মর্ত্যে আসতে তাঁর সাতদিন সময় লাগে। এ কারণেই মহালয়ার সপ্তম দিনেই শুরু মাতৃঅর্চনা।

কৈলাস থেকে মর্ত্যে আসার চারদিন বাদে আবার পতিগৃহে যাত্রার জন্য দেবী বাহন হিসেবে ব্যবহার করেন— গজ, ঘোটক বা ঘোড়া, দোলা বা পালকিতে ও নৌকা। অবশ্য কোনো কোনো কাহিনিতে বাহন হিসেবে নৌকার পরিবর্তে বৃষের নাম পাওয়া যায়। যাতায়াতের জন্য দেবীর এই চার বাহন ব্যবহারের কথা হয় চাররকম। যেমন যাতায়াতের বাহন হাতি হলে বসুন্ধরা হয় শস্যশ্যামলা। একই ভাবে বাহন ঘোড়া হলে ফল হয় ছত্রভঙ্গ, দোলায় হয় মড়ক এবং নৌকায় গতায়াত হলে বন্যা ও শস্য বৃদ্ধি।

মহালয়ার দিন দেবীর পিতৃগৃহে রওনা হওয়ার কথা মাথায় রেখেই সম্ভবত মৃৎশিল্পীরা এদিন প্রতিমার চোখ আঁকার কাজ শুরু করেন। পরিস্থিতির চাপে ইদানীং সব সময় এই রীতি অনুসরণ করা না হলেও বনেদি বাড়ির পুজোয় এখনও চলছে এই পরম্পরাই।

উৎস যাইহোক, তর্পণের মন্ত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মধ্যে রয়েছে প্রকৃতি ও বিশ্বের সকলের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আকুতি। তাই নিজের পিতৃপুরুষদের স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে চেনা-অচেনা, সম্পর্কহীন এই জীবজগতের সকলের প্রতিই শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। দান করা এক অঞ্জলি জল। বলা হয়, সুদূর সেই অতীতে সপ্তদ্বীপের অধিযাত্রী দেবর্ষি, মানব, পিতৃপুরুষ এবং আব্রহ্মস্তং পর্যন্ত সকলেই আমার এই সংহিতায় উদকাঞ্জলি গ্রহণ করুন। তৃপ্তি লাভ করুন সকলে।'

বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক জগতে ভাগ করে সবকিছু সকলের সঙ্গে উপভোগ করার অথবা বিনাস্বার্থে কাউকে কিছু না দেওয়ার যে প্রবৃত্তি ক্রমশ মানুষকে নিঃস্ব ও একাকী করে তুলেছে। মহালয়া সেই স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিরাজ'— সেই পরমশক্তির কাছে নিঃশর্ত আত্মনিবেদনের এক অপূর্ব অনুষ্ঠান। সব বিভেদের বেড়া ভেঙে সকলের সঙ্গে একীভূত হওয়ার আন্তরিক অনুষ্ঠান।

খিদিরপুর 'বাকুলিয়া হাউস'-এর ঐতিহ্যপূর্ণ দুর্গাপুজো

সপ্তর্ষি ঘোষ

খিদিরপুর 'বাকুলিয়া হাউস'-এর মুখার্জি পরিবার কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পরিবার। 'বাকুলিয়া হাউস'-এর দুর্গাপুজো কলকাতার প্রাচীন ও বনেদি পরিবারের পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম। এবার এদের দুর্গাপুজো ১৬২ তম বর্ষে পদার্পণ করলো।

দুর্গাপুজোর বর্ণনায় যাবার আগে মুখার্জিদের পারিবারিক পরিচিতি জেনে নেওয়া যাক। এদের আদিনিবাস ছিল হুগলি জেলার বাকুলিয়া গ্রাম। আজ থেকে আনুমানিক দু'শো বছর আগে বাকুলিয়া ছিল বর্ধিষ্ণু গ্রাম। অনেক সচ্ছল পরিবারের বাস ছিল এই গ্রামে। পরিবারের আদিপুরুষ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় কলেজের পাঠ শেষ করে ১৮৪০ সালে বাকুলিয়া গ্রাম ত্যাগ করে খিদিরপুরে আসেন। খিদিরপুর তখন শহরতলি। তিনি 'বাকুলিয়া হাউস'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং একই সঙ্গে মুখার্জি পরিবারে দুর্গাপুজোরও প্রতিষ্ঠাতা। বিশ্বেশ্বর ছিলেন কৃতী পুরুষ ও সফল ব্যবসায়ী। ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে তাঁর বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। একদা জমিদারি ও সম্পত্তির আয় থেকে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। সেই সময় বিশ্বেশ্বর খিদিরপুরে প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈরি করেন এবং জন্মভূমির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে বাড়ির নামকরণ করেন 'বাকুলিয়া হাউস'। একবার দুর্গাপুজোর সময় সহধর্মিণীর বাকুলিয়া যেতে অসুবিধা হওয়ায় বিশ্বেশ্বর খিদিরপুরে মায়ের পুজো করার সংকল্প করেন। সেই ইচ্ছানুসারে ২ নম্বর বিশুবাবু লেনের (বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত রাস্তা) বাড়িতে তৈরি হলো ঠাকুরদালান। সেই দুর্গাপুজোর সূচনা বাকুলিয়া হাউসে। ১২৬৭ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৮৬০ সাল)। বাকুলিয়া হাউসের পুজো কখনও বন্ধ হয়নি। পুজোর শুরু থেকে ১২৭৫ বঙ্গাব্দ (নয় বছর) একই ঠাকুরদালানে দুর্গাপুজো, বাসন্তী পুজো ও অন্নপূর্ণা পুজো অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারপর বিশ্বেশ্বরের মাতৃদেবীর মৃত্যুকালীন নির্দেশ অনুসারে ১২৭৬ বঙ্গাব্দ থেকে 'বাকুলিয়া হাউস'-এ শুধুমাত্র দুর্গাপুজো হয়ে আসছে।

ডাকের সাজে সজ্জিতা অনিন্দ্যসুন্দর দেবীমূর্তি। ধ্যানের মন্ত্রানুযায়ী দশভুজার দশপ্রহরণ প্রতিমার বৈশিষ্ট্য। দেবী এখানে সপরিবারে অধিষ্ঠিত। ঠাকুরদালানেই প্রতিমা গড়া হয়।

'বাকুলিয়া হাউস'-এর দুর্গাপুজোকে ঘিরে রয়েছে অনেক গল্পগাথা, অলৌকিক কাহিনি। একবার পুজোর অল্প কিছুদিন বাকি। প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। একদিন সকালে ভাণ্ডারঘর খুলে বাড়ির মহিলারা বিস্মিত। চারিদিকে ইতঃস্তত বড়ো মাঝারি নানারকম পায়ের ছাপ। লক্ষ্মীর ধানের ঝাঁপি পর্যন্ত। এমনকী সিংহের পায়ের চিহ্ন। মা দুর্গা যেন সপরিবারে এসেছেন। আর একবারের ঘটনা। সেবছর সন্ধিপুজোর তিথি পড়েছিল মধ্য রাতের পরে। সন্ধিপুজো শেষ হলো রাত দুটোয়। সারাদিন পুজোর আয়োজনে ব্যস্ত থাকায় বাড়ির প্রত্যেক সদস্য ক্লান্ত, অবসন্ন। সবাই ব্যস্ত প্রসাদ গ্রহণের জন্য। হঠাৎ সবাই লক্ষ্য করল, ভাণ্ডার ঘরের কাছে ফ্রক পরা একটি ছয় সাত বছরের মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন কিছু চায়। অনেকে ভাবল ঘরের পরিচারকের মেয়ে বুঝি ঘুরে বেড়াচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সে তো অন্দর মহলে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কিন্তু পরে অনেক খুঁজেও তাকে পাওয়া গেল না। মা ছোট্ট রূপ নিয়ে মনে হয় বাকুলিয়া হাউসে এসেছিলেন!

১৯৩৮ সাল। দুর্গাপুজোর প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ অন্নপূর্ণা দেবী তখন মৃত্যুশয্যায়। তদানীন্তন সময়ের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী কবিরাজ গঙ্গাযাত্রার আয়োজন করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এদিকে বাড়িতে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পুজোর মধ্যেই সে ব্যবস্থা হলো খিদিরপুর আদি গঙ্গার ঘাটে। দেখতে দেখতে পুজোর চারদিন অতিক্রান্ত হলো। দশমীর বিসর্জন সংবাদ স্বকর্ণে শুনলেন অন্নপূর্ণা দেবী। পুজোর সব কাজ যথাযথ হয়েছে কিনা খোঁজে নিলেন। তারপরই তিনি দেহরক্ষা করেন।

জাঁকজমকের আধিক্য না থাকলেও 'বাকুলিয়া হাউস'-এর পুজো অত্যন্ত নিষ্ঠা, ভক্তি ও শুদ্ধাচারে সম্পন্ন হয়। দীক্ষিত মহিলা ব্যতীত অন্য কেউ ভোগ রান্না করতে পারবে না। অতীতে পুজোর চারদিন প্রত্যেক দর্শনার্থী পেত একসরা করে প্রসাদ। দরিদ্রনারায়ণ সেবার আয়োজন হতো সপ্তমী থেকে নবমী। দেড় থেকে দু'হাজার মানুষ তাতে অংশ নিত। সে ধারা আজও অটুট আছে। তবে বর্তমান আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেই সংখ্যা এখন কমে হয়েছে তিনশো থেকে চারশো জন।

ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে সগৌরবে বহন করে ১৬১ বছর ধরে দুর্গাপুজোর আয়োজন করে চলেছেন বাকুলিয়া হাউস-এর মুখোপাধ্যায় পরিবার। এই ঐতিহ্যমণ্ডিত মাতৃপ্রতিমা দর্শন করতে পুজোর ক'দিন বহু দর্শনার্থীর সমাগম হয় বাকুলিয়া হাউসে। ▯

ভারত থেকেই কেন দুর্গা প্রতিমা বিদেশে নিয়ে যাওয়া হয়?

তরুণ কুমার পণ্ডিত

অতিমারী আবহে ২০২০ সাল থেকেই কলকাতার কুমোরটুলিতে দুর্গা প্রতিমা তৈরিতে পড়েছে ভাটা। একে কোভিড বিধির বাড়বাড়ন্ত তার ওপরে করোনার প্রকোপ সবমিলিয়ে বিদেশগামী দুর্গা প্রতিমার সংখ্যা ক্রমশ নিম্নগামী। ২০০৬ সালের হিসেব অনুযায়ী কুমোরটুলি থেকে যেখানে মোট ১২৩০০টি দুর্গা প্রতিমা বিশ্বের ৯০টির বেশি দেশে পাড়ি দিয়েছিল সেখানে এবছর ছয়টি দেশে মাত্র ১৫০টি জায়গায় এখন পর্যন্ত কুমোরটুলি থেকে দুর্গা প্রতিমা রওনা দিয়েছে। স্বভাবতই অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, কেবলমাত্র ভারতে তৈরি দুর্গা কেন বিদেশে যায়? অন্য দেশেও তো প্রতিমা তৈরি হতে পারে। কিন্তু দেখা গেছে ভারত থেকেই ইংল্যান্ড, আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, কানাডা প্রভৃতি দেশে এদেশের তৈরি প্রতিমা বাক্সবন্দি হয়ে বিমানে চড়ে প্রবাসী বাঙ্গালিদের কাছে চলে যায়।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতে মূলত তিনটি উপাদান আবশ্যক। এই তিন উপাদান ছাড়া বানানো যায় না মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তি। মাটির তৈরি মূর্তিতে গঙ্গামাটি, গোবর ও গোমূত্র এই তিন মূল উপাদানের প্রয়োজন হয়। যেহেতু দেবভূমি ভারতবর্ষে পবিত্র গঙ্গানদী প্রবাহিত এবং গোরুকে হিন্দুরা দেবতা হিসেবে পূজা করে সেজন্যে আর অন্য কোনো দেশে শক্তির আরাধ্য দেবী দুর্গার মূর্তি তৈরি করা হয় না। অন্যদিকে বিদেশের মাটিতে শরতের শিউলি আর কাশবনের দোলা কোথাও চোখে না পড়লেও কিংবা আকাশবাণী থেকে প্রচারিত মহালয়াতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সেই দেবীস্তোত্রের তন্ময়ী সুর না শোনা গেলেও, তবু হৃদয়ে লালিত শাস্ত্র আর সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য মনন বাঙ্গালিকে শারদীয়া দুর্গাপূজার জানান দেয়।

বিভিন্ন বিধিনিষেধের জন্য পঞ্জিকার নির্ঘণ্ট মেনে প্রবাসী বাঙ্গালিরা পূজার সকল শাস্ত্রীয় কর্মকাণ্ড নিষ্ঠা সহকারে সম্পন্ন করতে পারেন না। বিদেশের অতিব্যস্ত হিন্দু সমাজ পূজার ক'দিন একসঙ্গে মিলিত হয়ে

একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে আসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চার লক্ষ টাকা দামের বিগত বছরের দুর্গা প্রতিমা (উচ্চতা ১০ ফিট ও চওড়া ২০ ফিট) এবছর কুমোরটুলি থেকে বাক্সবন্দি হয়ে সুদূর সানফ্রান্সিসকোতে রওনা দিয়েছে।

ভারতের মাটিতে তৈরি দুর্গা প্রতিমা ছাড়া যে বিদেশের মাটিতে শারদীয়া পূজা অনুষ্ঠিত হবে না একথা অনেকের কাছে অজানা থাকলেও স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের এই পবিত্র ও পুণ্যভূমির কথা বলে গেছেন। দীর্ঘ সাত বছর আমেরিকায় কাটিয়ে যখন তিনি ভারতের মাটিতে প্রথম পা ফেললেন, হঠাৎ সমুদ্রতটে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন। জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন, আমি এতদিন বিদেশের ভোগভূমিতে থেকে অপবিত্র হয়ে গেছিলাম, এবারে এদেশের মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পবিত্র ও শুদ্ধ হলাম। এইকরকম ভাবে ঋষি অরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এদেশকে কেবলমাত্র মৃন্ময়ী নয় চিন্ময়ী সত্তা হিসেবে চিরকাল দেখে এসেছেন।

এই মহাবিশ্বের মধ্যে দেবভূমি ভারতবর্ষের স্থান খুব উঁচুতে। এই পরম পবিত্র অধ্যাত্ম ক্ষেত্র দেব-দেবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লীলা ভূমি রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। সমগ্র পৃথিবীর অধ্যাত্ম চেতনা, দিব্য ভাবনা, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র চিরন্তন ধর্মগুরু এই দেবভূমি ভারতবর্ষে অন্তর্নিহিত রয়েছে। তাইতো সাধক শ্রীঅরবিন্দ এদেশ সম্পর্কে বলেছিলেন, অন্য লোকে এদেশকে জড় পাহাড় পর্বত ও নির্জীব বলে মনে করে, আমি এই চৈতন্য ও চিন্ময়ী সত্তা বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা। বঙ্কিমচন্দ্র দেশ মায়ের বন্দনা করে লিখলেন, তুমি দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা। এই দিব্য অধ্যাত্মপূর্ণ দেবভূমি ভারতবর্ষেই রয়েছে মহাশক্তির ১০৮ সতীপীঠ, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ, চারধাম, সপ্ত মোক্ষ পুরী, পবিত্র নদী ও তীর্থস্থান। সব মিলিয়ে ভারতের মাটিতে তৈরি দেবী দুর্গা শুধু মানব জাতির নয়, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বস্তরের দেব-দেবী, মানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর ও পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ ও তরুলতা প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম সর্ব প্রাণ সর্ব জীব, সর্ব আত্মা, সর্ব লোক মুক্তি লাভ করুক ও সকলের কল্যাণ হোক তাঁর আরাধনায়। ভাগবতে দেবতারা ভারতবর্ষকে বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ বলে অভিহিত করেছেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'অন্যস্থানে বৃথা জন্ম নিষ্ফলং চ গতাগতম্। ভারতে চ ক্ষণং জন্ম সার্থকং শুভকর্ম্মদম্।

অর্থাৎ অন্যত্র জন্মগ্রহণ করা বৃথা ভারতে ক্ষণমাত্র জন্মও সার্থক ও কল্যাণপ্রদ। ভারত থেকে বিদেশে যেসব দুর্গা প্রতিমা যায় সেগুলো যে কেবল মাটির তৈরি হয় তা কিন্তু নয়। শোলা, ফাইবার ও অন্যান্য উপাদান দিয়ে তৈরি প্রতিমা বহির্বিশ্বে পাড়ি দেয়। তবে লক্ষণীয় বিষয় বিভিন্ন উপাদান দিয়ে তৈরি প্রতিমার সঙ্গে একটি ছোট্ট মাটির তৈরি দুর্গা অবশ্যই কুমোরটুলির কারিগররা দিতে ভোলেন না। কেননা একমাত্র ভারতের মাটি দিয়ে তৈরি মায়েরই পূজা করা হয়ে থাকে।

দুর্গাপুজো এলেই ফেলে আসা দিনগুলির কথা মনে পড়ে

রামানুজ গোস্বামী

প্রত্যেক বছর পুজোর সময় আমি ফেলে আসা দিনগুলিতে ফিরে যাই। সেই সময় কলকাতাতেও পুজোর কাছাকাছি সময়ে হালকা একটা শীতের আমেজ দেখা দিত। শরৎ আসা মানেই ঘাসের আগায় শিশিরের রেখা আর রাতের দিকে শীত-শীত ভাব। বেশ মনে আছে, মহালয়ার সময়ে গায়ে চাদর চাপাতে হতো। সকাল হতেই ছুটে যেতাম পাড়ার দুর্গামণ্ডপে। সেখানে যে একটু একটু করে সেজে উঠছেন মা দুর্গা। বহু বারোয়ারি পুজোতেই তখনও একচালার প্রতিমার চল ছিল। চোখের সামনে নিত্যদিন দেখেছি কীভাবে কেমন করে প্রথমে বাঁশের কাঠামোয় খড় দিয়ে বেঁধে প্রাথমিক গঠন তৈরি হয়; তারপর মাটির প্রলেপ পড়ে। একমেটে আবার দোমেটে। সবশেষে রঙের ছোঁয়া। শিল্পীর হাতের জাদুতে দেবী হয়ে ওঠেন অপরূপা। দেবীর বাহন সিংহ। ছেলেবেলায় চণ্ডীমণ্ডপে ঠাকুর তৈরি হওয়া দেখতে গিয়ে কতবার যে সিংহের কেশরে হাত বোলাতাম, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। আসলে সবটাই ছিল শিশুসুলভ কৌতূহল।

পুরনো দিনের পুজো আর আজকের পুজোর তফাত অনেক। পুজো আমাদের প্রাণের উৎসব। তাই সারা বছর অপেক্ষা করে থাকতাম দুর্গাপুজোর জন্য। কিন্তু মাত্র কয়েক দশক আগেও এই উৎসবকে আমরা 'দুর্গাপুজো' বলেই জানতাম। এখন তা 'থিমপুজো'। তাই পুজোয় আর থাকে না ধর্মের বাতাবরণ, শাস্ত্রীয় বিধি। এখন ভাঁড়, ছেঁড়া কাপড়, হাতপাখা, টানা রিকশা, গামছা কিংবা ছেঁড়া চটের প্যান্ডেলের যুগ পড়েছে। প্রতিমাও বিবর্তনের হাত ধরে যুগান্তকারী— দেখলে চমকে উঠতে হয়। আসলে মানুষের নিজের অন্তঃকরণ যে ভাবে বদলায় বা যে রূপে বদলায়, দেব-দেবীকেও মানুষ ঠিক সেই ভাবেই দেখতে চায়। তাই হয়তো বা শাস্ত্রীয় সনাতনী দেবী প্রতিমার বদলে একালের থিমের প্যান্ডেলের প্রতিমা দেখতে পাঁচ মাইল লম্বা লাইন পড়ে। এতে আশ্চর্য হওয়ার মতো কোনো ব্যাপারই নেই। যুগটাই যে মূল হারানোর যুগ। এ যেন গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার মতো ব্যাপার।

বেশ মনে আছে তখন শিউলি ফুল আর চাঁপা ফুলের মতো রোদও জানান দিয়ে যেত যে, জগজ্জননী আসছেন। দিন গোনা শুরু হয়ে যেত আমাদের। বিশ্বকর্মা পুজো হয়ে গেলে তে আর কথাই নেই। পুজোর তখন হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটা দিনই বাকি। অবধারিত ভাবেই শুরু হয়ে যেত পুজোর চারদিন কী করা হবে, কী খাওয়াদাওয়া হবে আর কোথায় কোথায় যাওয়া হবে, তার প্ল্যানিং।

তারপর আগত মহালয়া। রেডিয়ো, টেলিভিশন (এটা অবশ্য অনেক পরে এসেছে) আর সকালের খবরের কাগজের দৌলতে যে কথাটি সেই কোন্ ছেলেবেলায় মনের মণিকোঠায় স্থান পেয়েছিল, তা আজও জ্বলজ্বল করছে। কথাটি সাধারণ— তবে আমার কাছে এর গুরুত্ব অপরিসীম। 'আজ মহালয়া— পিতৃপক্ষের অবসান; দেবীপক্ষের সূচনা।' তখন শুধুই প্রতীক্ষার পালা।' কবে পুজোয় পাওয়া নতুন জামাকাপড় পরে ঠাকুর দেখতে যাওয়া হবে। স্কুলের ছুটি হতো আরও কিছুদিন পরে। তৃতীয়া বা চতুর্থীর দিন। তবে যা হয় আর কী, ওই শেষের কয়েকটি দিন আর পড়ার সঙ্গে তেমন কোনো সম্পর্ক থাকতো না বললেই চলে। পাড়ায় পাড়ায় পুজোমণ্ডপে ঠাকুর এসে পৌঁছত তৃতীয়ার দিনেই; আবার কোথাও হয়তো-বা চতুর্থীতে। এখন অবশ্য অনেক নামজাদা পুজো প্যান্ডেলে মহালয়ার আগেই পুজোর উদ্বোধন হয়ে যায়, যা খুব একটা শাস্ত্রসঙ্গত নয়।

অষ্টমীর দিনটায় অঞ্জলি দেবার জন্য প্রচণ্ড ভিড় হতো। ছেলে থেকে বুড়ো, নবীনা থেকে প্রবীণা— এক মণ্ডপে সকলেই হাজির সেইদিন। তারপরে দুপুর বেলায় সবাই মিলে পুজোর খিচুড়ি ভোগ খওয়ার মজা ছিল সত্যিই অতুলনীয়।

মহাষ্টমীর পরের আকর্ষণ ছিল সন্ধিপুজো। অষ্টমী ও নবমীর পুণ্য সন্ধিক্ষণেই অনুষ্ঠিত হয় সন্ধিপুজো। তিথি তারতম্য অনুসারে এক এক বছরে এক এক সময়ে পড়ে এই সন্ধিলগ্ন; কখনো বা গভীর রাত্রে, কখনো বা সন্ধ্যায়। সেইসব দিনের স্মৃতি, সেই প্রদীপ সাজিয়ে রাখা, গভীর রাত্রির নির্জনতায় বসে আরতি দেখা— সে এক অপার্থিব অনুভূতি। আজ এই বয়সেও তা মনকে নাড়া দিয়ে যায়। নবমীর বিকেল গড়িয়ে আসতেই মনখারাপের পালা শুরু। আবার এক বছর পরে কৈলাস থেকে মা আসবেন তাঁর পিতৃগৃহে।

বিজয়া দশমীতে বিকেলের পর হতো প্রতিমা বিসর্জন। তখনকার দিনে জোড়া নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে দেওয়ার রীতি ছিল প্রচলিত। আইনের এত কড়াকড়ি তখনো হয়নি। পুজোর প্রাক্কালে এবং পুজোর সময়ে এমনিতেই বাড়িতে আত্মীয় অনাত্মীয়ের ভিড় দুবেলা লেগেই থাকতো। এর উপরে আবার ছিল বিজয়ার আকর্ষণ। সেইদিন সন্ধ্যার পর বাড়িতে প্রচুর লোকসমাগম হতে দেখেছি। সমবয়সিরা কোলাকুলি করতেন, ছোটোরা করতো বড়োদের প্রণাম আর বড়োরা করতেন ছোটোদের আশীর্বাদ। বিজয়ার মিষ্টিমুখ করানোর প্রথা ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মিষ্টি ঘরে তৈরি করা হতো। আসলে, আজকালকার মতো যে কোনো উপলক্ষ্যে, যে কোনো বিষয়ে হোটেল বা দোকানের উপরে নির্ভরতা ছিল না সেযুগে। বিশেষত লোকজন কেউ বাড়িতে এলে, বাড়িতে তৈরি খাবার দেওয়াটাই ছিল রীতি।

(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক)

ফ ঃ ৫

স্মৃতিপটে দুর্গাপূজার সেকাল-একাল

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটোবেলায় প্রতিমা গড়া শুরু হলে টের পেতাম পুজো আসছে। অনুষঙ্গ হিসেবে মায়ের ঘর পরিষ্কার, নতুন জামাকাপড় কিনতে যাওয়ার তোড়জোড়ে আমরা দেবীর আগমনবার্তা পেতাম। মা-ঠাকুমা ঠাকুরবাড়ির ধুতি, শাড়িতে হলুদ রং করে ছাদে শুকোতে দিতেন। ঢেকিতে চাল, হলুদ গুঁড়ো করতে যেন। গুড়পিঠে, টানালাড়ু হবে। ঠাকুর বাড়িতে নকুল সূত্রধর একমেটে করে রেখে দিত, বলে যেত মাটি শুকুক তারপর আসব। বেশ কিছুদিন কেটে গেলে, মাটি শুকোলে ছুটতাম মৃৎশিল্পী নকুলের কাছে। নকুল বলত দু-মেটের জন্য শুকনো সাদা কাপড় জোগাড় করো। আমরাও বাড়ি-বাড়ি তা সংগ্রহ করে প্রতীক্ষা করতাম। দু-মেটের সময় গোল করে বসতাম। বন্ধুদের মধ্যে আলোচনা হতো দেবীর দশ হাতে কী কী অস্ত্র থাকে তাই নিয়ে। জামা-প্যান্ট তৈরির দর্জি ছিলেন তেজুবাবু। ইস্কুলের পথেই দোকান। দু'চারবার জিজ্ঞাসা করা হতো কবে নতুন পোশাক পাব। নতুন পোশাক পেলে নতুনের গন্ধ নেওয়া ছিল একটা নেশা। নতুন বইয়ের গন্ধের মতো। কী যে আনন্দ হতো বলে বোঝাবার নয়। পরে এক একটি অষ্টমী পেরোত, যেমন, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, জিতাষ্টমী, তার পরে মহাষ্টমী। মায়ের কীসে যে আগমন, এসব ছিল আমাদের বন্ধুবর্গের আলোচনার বিষয়।

মণ্ডপসজ্জার জন্য বড়োরা রাতজেগে কাগজের ফুল কাটতেন প্রায় একমাস ধরে। গেটে তোপ দাগার জন্য বারুদ তৈরির প্রস্তুতি চলতো। পুজোর তিনদিন এবং সন্ধিক্ষণের আরতির সময় এই তোপধ্বনি হতো। প্রতিমার খড়ি, রং, চক্ষুদান ইত্যাদির দিনগুলি ছিল সোনালি। সঙ্গে মণ্ডপের গায়েও পড়তো রং। চারপাশে ঘাস কেটে এক অভিনব পরিবেশ রচিত হতো। দেখতে দেখতে ষষ্ঠীর বিকেলে রান্নার ঠাকুর, ঢাকি, বাসন পরিষ্কার করার মানুষজন এসে উপস্থিত হতো। সন্ধ্যা হলেই বাঁশির সুর বাজতো— ওমা দিগম্বরী নাচ গো... ঠাকুরমশায় নবপত্রিকার জন্য প্রস্তুত হতেন। আমাদের প্রশ্ন নবপত্রিকা সম্পর্কে, পুরোহিতমশায় উত্তরে বলেছিলেন নয়টি প্রকৃতির মূল, দেবীর প্রতীক। শুরু হতো পুজো, আমরা বন্ধুরা ঝাঁঝ, ঘণ্টা নিয়ে প্রস্তুত। তারপরেই একবার বলা হতো স্বেচ্ছাসেবী কারা হবে এবং তাঁদের কাজ বোঝানো হতো। আমরা স্বেচ্ছাসেবীর ব্যাজ পেলে বেশ একটা আনন্দ পেতাম। পরেরদিন সপ্তমীর সকালে ফুল তোলা, তারপরে স্নান করে দেবীকে আনার জন্য সকলের সঙ্গে নদীঘাটে যেতাম। নদীতে ঘট পূর্ণ করে, নবপত্রিকা মন্ত্র-সহ স্নান করিয়ে মণ্ডপে প্রবেশ। সারা মণ্ডপে তখন মেলার পরিবেশ। সারা বছর নানা কাজে যারা ব্যস্ত থাকতেন তারাও আজ মণ্ডপে, মনে বেশ জোর পেতাম। সারা পাড়া একটা পরিবার মনে হতো। দেবীর আরতির পর অন্নভোগ বিতরণ বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসতে হতো। আমাদের ডাক পড়তো, এই ভোগ বিতরণ করতে গিয়ে পাড়ার সবার বাড়ি জানা হয়ে গিয়েছিল। অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে পুজোর ভোগ এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করতে হতো। পুজো শেষে প্রসাদ নেওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। নবমীর সন্ধ্যা থেকেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠতো। অনেক শিল্পী উপস্থিত হতেন, চলতো রাগরাগিণীর মুরুব্বিয়ানা। না বুঝলেও কানের ভিতর দিয়ে মনের জানালা খুলে যেত। নবমীর রাত্রিতে মা মেনকার আর্তি প্রকাশ পেত, নবমী নিশিরে তোর দয়া নাই...। পরদিন দশমী, সকাল থেকে বিসর্জনের তোড়জোড়, মন ভারাক্রান্ত হয়ে আসতো। মায়ের নির্দেশে বিল্বপত্রে মাতৃনাম লিখে অঞ্জলি দিতাম।

মা-কাকিমাদের সিঁদুর খেলা। সবমিলে দশমীর সকাল যেন দেবীর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনার অনির্বচনীয় মুহূর্ত হয়ে উঠতো। এরপর ঢাকবাদ্য সহকারে আবালবৃদ্ধ বণিতা উপস্থিত হতো নদীঘাটে। সবাই তো ভাই-বন্ধু-পরিজন। বিসর্জনের পরে বড়োদের প্রণাম, বন্ধুবর্গের আলিঙ্গন।

ছোটোবেলায় মহালয়ার ভোরে মহিষাসুরমর্দিনীর স্তোত্রপাঠ-সহ গান মনের মধ্যে এক মায়াজাল সৃষ্টি করতো। বড়োবেলায় সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হয়েছি। বড়ো হওয়ার পর প্রথম অনুভব এসেছিল যখন মাথায় 'ঘট' নেওয়ার আদেশ পেলাম। ধীরে ধীরে পুজোর গুরুদায়িত্ব; সঙ্গে উৎসবের গুরুত্ব অনুভবের প্রেরণা। বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ উৎসব কেন? এর সঙ্গে যুক্ত থাকা সমাজ, অর্থ, সংস্থা, পরম্পরা ইত্যাদির নতুন আস্বাদন এসেছে। দেবীর সঙ্গে থাকা দেব-দেবী পুত্র-কন্যা ও বাহন ইত্যাদির গুরুত্ব উপলব্ধি হয়েছে। উত্থন থালা, পঞ্চশস্য, পঞ্চগব্য ইত্যাদির সঙ্গে হোমের ভূমিকা প্রভৃতি নতুন বার্তা মনে দেবীর শক্তি অনুভূত হয়। প্রতি বছর একই আঙ্গিকেই নিত্য-নতুন বার্তা বহন করে আনে। ▯

মা দুর্গা এখন মোবাইলে আবদ্ধ

অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটোবেলার দুর্গাপূজার কথা মনে পড়লে সত্যিকথা বলতে কী মনটা খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় সেই দিনগুলো যদি ফিরে আসতো, কী মজাটাই না হতো।

পুজোর কদিন বাবা আমাদের ভাই-বোনদের নিয়ে পুজোর বাজার করতে বেরোতেন। বাবার একটা হিলম্যান গাড়ি ছিল, তাতে আমরা সবাই হাতে একটা করে খালি ব্যাগ নিয়ে চড়ে বসতাম, পুজোর জামা, জুতো সব ঢোকাতে হবে তো। বাবার প্রিয় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স ছিল ধর্মতলার কমলালয় স্টোর্স। ওখান থেকে জামাকাপড় কেনার পর বাবা নিয়ে যেতেন তাঁর প্রিয় জুতোর দোকান বাটায়।

পঞ্চমীর দিন থেকেই ভোরবেলা গ্রামগঞ্জের থেকে আসা ঢাকিরা ঢাক বাজাতে বাজাতে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে পথ পরিক্রমা করত, খুব ভালো লাগতো শুনতে।

এখন মহাষ্টমীর দিন দুর্গাবাড়িতে অঞ্জলি দিতে যাই। পরিবেশটাই পালটে গেছে। অল্পবয়সি ছেলে-মেয়েরা দেখতে পাই জটলা করে আড্ডায় মেতেছে, নয়তো ফুচকা খাচ্ছে হই হই করে। মা দুর্গার প্রতি কোনও ভক্তিভাব চোখে পড়ে না।

ছোটোবেলায় সন্ধ্যাবেলা মা-বাবার সঙ্গে ঠাকুর দেখতে যেতাম। তখনকার বিখ্যাত মৃৎশিল্পী ছিলেন রমেশ পাল। বাবা আমাদের নিয়ে পার্কসার্কাস, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার আর ফায়ার ব্রিগডের পূজা দেখাতে নিয়ে যেতেন কারণ ওই পূজাগুলিতে দুর্গাপ্রতিমা নির্মাণ করতেন রমেশ পাল। মুগ্ধ হয়ে মা দুর্গার অসুরদলনী মূর্তি দেখতাম, সঙ্গে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী পৃথক পৃথক মঞ্চে দণ্ডায়মান। শিল্পী রমেশ পালের করা মাতৃমূর্তি আজও যেন চোখে ভাসে।

ছোটোবেলায় 'থিমপুজো' শব্দটাই শুনিনি, কারণ এই শব্দটি তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। এখন বিভিন্ন পূজা কমিটি একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। সেক্যুলারিস্টদের খপ্পরে পড়ে দুর্গাপূজা আজরাল শারদোৎসবে পরিণত হয়েছে। পূজা আর উৎসব এক নয়, পূজায় আধ্যাত্মিকতার, ভক্তির পরিমণ্ডল থাকে, উৎসবে যা অনুপস্থিত।

আমার ছোটোবেলায় দুর্গামণ্ডপের যাবার পথে রাস্তার দু'পাশ জুড়ে এত বিজ্ঞাপন কখনো দেখিনি। এখন বিশাল বিশাল হোর্ডিং, ব্যানার, পোস্টার, আর তৎসহ লাউড স্পিকারে হিন্দি সিনেমার চটুল গান। ছোটোবেলাতেও লাউডস্পিকারে গান বাজত, কিন্তু সেই গানগুলি ছিল শোনার মতো। কোনও প্যান্ডেলে শুনতাম দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত, কোনও প্যান্ডেলে হেমন্তর 'দুরন্ত ঘূর্ণীর এই লেগেছে পাক', নয়তো লতার কণ্ঠে 'আকাশপ্রদীপ জ্বলে', অথবা শ্যামল মিত্রের 'আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে, সাতসাগর আর তেরো নদীর পারে'।

ছোটোবেলায় ঠাকুর দেখতে যাওয়াটা খুব আনন্দদায়ক ছিল, এখন ইচ্ছেই করে না যেতে। ম্যাডাক্স স্কোয়ারে কী সুন্দর পরিবেশ ছিল দুর্গাপূজার, আর এখন? পূজা প্যান্ডেল এখন কলেজের ছেলে-মেয়েদের মিলনক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন বারোয়ারি পূজায় গেলে তাদের কথোপকথন শুনলে দুঃখ হয়, কিন্তু অবাক হই না, এটাই নাকি এখনকার রীতি! কোনও মণ্ডপে শোনা যায় একটি মেয়ে তার বান্ধবী বা বান্ধবকে বলছে— 'চল, মহিষাসুরের সঙ্গে একটা সেল্‌ফি তুলি' কেউ বলছে— 'দ্যাখ, মা দুর্গার একটা পাসপোর্টসাইজ ছবি নিয়ে নিলাম', কোথাও-বা শুনছি এক জিন্স পরিহিতা তার বান্ধবীকে বলছে— 'ফরোয়ার্ড কর, ফরোয়ার্ড কর'। দেবী-দেবতারা এদের মোবাইলেই আবদ্ধ, হৃদয়ে স্থান নেই, এটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। ছোটোবেলার দুর্গাপুজো স্মৃতিতেই থাক, সমাজ যত আধুনিক থেকে আধুনিকতর হবে, আরও টেকনোক্রেটিক হবে, ভোগবাদ আরও বৃদ্ধি পাবে। দুর্গাপূজার আড়ম্বর আরও বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু ভক্তি ও ধর্মচেতনা হয়তো হারিয়ে যাবে, সেই দিনটি যত দেরিতে আসে, ততই মঙ্গল। ▯

ইতিহাসে হারিয়ে যাওয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের তিন কন্যা

রিয়া রায়

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে নারীদের যোগদান বললেই তথাকথিত ইতিহাসের পাতায় দায়সারা ভাবে লেখা কয়েকটি হাতে গোনা নাম আমরা পাই। বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারী বিপ্লবীদের নাম টেক্সট বইয়ের পাতার এক কোণে পড়ে থাকে! বিনা স্বার্থে বিনা শর্তে জীবনের মায়া ত্যাগ করে পরমানন্দে চিরবিদায় জানানো, দেশমাতৃকার মুক্তির আমন্ত্রণে জ্যোতির মহাসমুদ্রে মিশে যাওয়া এমন তিন বিস্মিতা নারীর ইতিহাস নিয়ে এই লেখা।

নীরা আর্য! ইতিহাসের পাতায় ভুলে যাওয়া এক বীরাঙ্গনা! নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের রানি ঝাঁসি রেজিমেন্টের অন্যতম বীর সেনানী। দেশমাতৃকার চরণে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন অকাতরে। নিজের স্বামীর বিরোধিতা পর্যন্ত করতে ছাড়েননি। ইংরেজ সেনাবাহিনীর পদস্থ অফিসার শ্রীকান্ত জয়রঞ্জন দাস নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে হত্যার পরিকল্পনা করেন, এমনকী এজন্য গুলিও চালিয়েছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশত সেই গুলি নেতাজীর গাড়ির চালককে বিদ্ধ করে। সেই মুহূর্তে সেখানেই উপস্থিত ছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের 'রানি ঝাঁসি রেজিমেন্ট'-এর নীরা আর্য। এই ঘটনায় তাঁর মনে স্বামীর বিরুদ্ধে এক ঘৃণার সঞ্চার হয়। জয়রঞ্জনকে তিনি দ্বিতীয় সুযোগ দেননি। চোখের পলকে তাঁর স্বামীর পেটে বেয়নেট চালিয়ে হত্যা করেছিলেন। এখানেই শেষ নয়, শুধু এটুকুই তাঁকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখানেই রয়েছে একটা অভাবনীয় চমক। নেতাজী ও স্বদেশের প্রতি এতটাই ভক্তি তাঁর যে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বনকারী নিজের স্বামীকে হত্যা করতেও দ্বিধা বোধ করেননি। অভিভূত নেতাজী নীরাকে অভিহিত করেছিলেন 'নাগিনী' নামে। আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানী নীরা আজও অমর হয়ে আছেন তাঁর এই অসামান্য কীর্তির জন্য। উত্তরপ্রদেশের বাগপত জেলার খেকড়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন এই বীরাঙ্গনা। তাঁর পিতা শেঠ ছজুমল ছিলেন সে সময়ের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। তাঁর ব্যবসায়ের মূল কেন্দ্র ছিল কলকাতায়।

এই কারণেই নীরার পড়াশোনা শুরু হয়েছিল কলকাতায়। হিন্দি, ইংরেজি, বাংলার পাশাপাশি আরও অনেক ভাষায় দক্ষ ছিলেন। নেতাজীর আদর্শে তিনি ছাত্রীজীবনেই উদ্দীপিত হন। বাড়ির চাপে বিয়ে হয় সিআইডি ইন্সপেক্টর শ্রীকান্ত জয়রঞ্জন দাসের সঙ্গে। ব্রিটিশ সরকার তাঁর স্বামীকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পিছনে নজরদারির এক বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিল।

দুর্গাবতী ভোরা

নীরা আর্য

সুযোগ মতো নেতাজীকে হত্যা করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শ্রীকান্তর চেষ্টা বারবার ব্যর্থ করে দেন তাঁর স্ত্রী নীরা। নেতাজী নীরাকে ফৌজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তার ভাই বসন্ত কুমারও আজাদ হিন্দ ফৌজে ছিলেন। গুপ্তচর হিসেবে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রচুর গোপন খবর নীরা সংগ্রহ করতেন সে সময়ে। বহু ঐতিহাসিক তাঁকে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম গুপ্তচর হিসেবে গণ্য করেন। ফৌজে নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত বহু বিষয়ে নীরা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন। তিনি লিখেছেন— 'আমাদের কাজ ছিল কান খোলা রাখা, সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলি নিয়ে আলোচনা করা, তারপরে নেতাজীর কাছে তা পৌঁছে দেওয়া। কখনও কখনও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ নথিও বহন করতে হতো। যখন মেয়েদের গুপ্তচরবৃত্তির জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল, আমাদের স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে, ধরা পড়লে নিজেরাই নিজেদের গুলি করতে হবে। একটি মেয়ে তা করতে পারেনি এবং ইংরেজরা তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। এতে আমাদের সংগঠনের সমূহ ক্ষতি হবে বুঝে আমি ও রাজামণি স্থির করেছিলাম যে, আমরা আমাদের সঙ্গীকে যেকোনও ভাবে মুক্ত করব। আমরা হিজড়ের নর্তকীর পোশাক পরে যেখানে আমাদের সঙ্গী দুর্গাকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল সেখানে পৌঁছেছিলাম। আমরা অফিসারদের মাদক খাওয়ালাম এবং আমাদের সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলাম। কিন্তু পালাবার পথে প্রহরারত এক সেনা আমাদের দিকে গুলি চালায়। তাতে রাজামণির ডান পা গুলিবিদ্ধ হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে কোনওক্রমে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এদিকে ধড়পাকড় শুরু হলে আমি ও দুর্গা একটা গাছের উপরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। অনুসন্ধান অব্যাহত ছিল, যে কারণে আমাদের ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তিন

দিন ধরে গাছের উপরেই থাকতে হয়েছিল। তিন দিন পরে আমরা সাহস করে সুকৌশলে সঙ্গীদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের ঘাঁটিতে ফিরে আসি। রাজামণির সাহসিকতায় নেতাজী খুশি হয়ে তাকে আইএনএর রানি ঝাঁসি ব্রিগেডে লেফটেন্যান্ট ও আমাকে অধিনায়ক করেছিলেন।'

আজাদ হিন্দ ফৌজ আত্মসমর্পণের পরে, সমস্ত বন্দি সৈন্যকে দিল্লির লাল কেল্লায় মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু নীরাকে স্বামী হত্যার কারণে দ্বীপান্তর দেওয়া হয়েছিল। জেলে বন্দিদশায় তাঁকে অকথ্য শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। শোনা যায় তাঁর স্তন দুটো কেটে ফেলা হয়েছিল। স্বাধীনতার পরে মুক্তি পেয়ে তিনি বাকি জীবনটা ফুল বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন। কোনও সরকারি সহায়তা বা পেনশন গ্রহণ করেননি। হায়দরাবাদের ফলকনমায় একটি কুঁড়েঘরে বাস করতেন। বার্ধক্যজর্জর অবস্থায় চারমিনারের কাছে ওসমানিয়া হাসপাতালে ১৯৯৮ সালের ২৬ জুলাই তিনি অসহায়, নিঃস্ব অবস্থায় প্রয়াত হন। ইতিহাসের বিস্মৃত এই বীরাঙ্গনা সম্পর্কে আজ সিংহভাগ মানুষ অবগত নন। তবে লোককবিদের মুখে মুখে 'নীরা নাগিনী'-কে নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক গান। পরে তাঁর নামে একটি জাতীয় পুরস্কার চালু করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বীরাঙ্গনা হলেন দুর্গাবতী ভোরা ওরফে দুর্গা ভাবি। দুর্গাবতীদেবী বিপ্লবী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগদানকারী অন্যতম রমণী! হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সদস্য প্রফেসর ভগবতীচরণ ভোরার স্ত্রী ও সকলের কাছে 'দুর্গাভাবি' হিসেবে পরিচিতা দুর্গাবতী নওজোয়ান সভার সদস্যা হিসেবে সকলের নজর কেড়েছিলেন। দুর্গাবতী ও তাঁর স্বামী দিল্লির কুতুব রোডে বিমলপ্রসাদ জৈন নামে এক হিন্দুস্তান রিপাবলিকন সোশ্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যকে 'হিমালয়ান টয়লেট' নামে একটি বোমা কারখানা (বোমা তৈরির প্রসঙ্গ গোপন করতে একটি ছদ্মনাম ছিল) চালাতে সাহায্য করতেন। এই কারখানায় তারা মূলত পিকরিক অ্যাসিড, নাইট্রোগ্লিসারিন ও

ইতিহাস একরকম হারিয়ে ফেলেছে এই তিন কন্যাকে। নিজের জীবনকে অকাতরে ব্যয় করেছেন অথচ যেখানে ছিল না কোনো ক্ষুদ্রস্বার্থের আঁশটে গন্ধ। অথচ ইতিহাসের পাতায় উপেক্ষিতা হয়ে রয়েছেন। লুপ্ত, অর্ধসত্য, জঞ্জালময়, আবর্জনাময় ইতিহাসের জাল কেটে সত্য উদ্ভাসিত হোক।

মার্কারি ফালমিনেট নিয়ে কাজ করতেন। অত্যাচারী জে.পি. স্যান্ডার্সকে হত্যার পর বিপ্লবী ভগৎ সিংহ ও শিবরাম রাজগুরুকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে সাহায্য করেছিলেন 'দুর্গাভাবী'! অজয় দেবগণ অভিনীত ভগৎ সিংহের জীবনের উপর বিখ্যাত ছবি 'দ্যা লেজেন্ড অব ভগৎ সিংহ' এ দেখা যাবে যে স্যান্ডার্স হত্যার দুদিন পর বিপ্লবী ভগৎ ও শিবরাম রাজগুরুকে পালাতে সাহায্য করার সেই বিখ্যাত দৃশ্য।

১৯২৯-এ ভগৎ সিংহ ও বটুকেশ্বর দত্তের দিল্লির কেন্দ্রীয় সংসদ ভবনে বোমা নিক্ষেপের পর দুর্গাবতী দেবী লর্ড হেইলিকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু একাজে তিনি অসফল হন। দুর্গাবতীদেবী পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান। ভগৎ সিংহ-সহ বাকি বিপ্লবীদের কারামুক্ত করার উদ্দেশ্যে নিজের গয়না অবধি বিক্রি করে সে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর খুব অনাড়ম্বর ভাবে জীবনযাপন করেছিলেন তিনি। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার চাকরি নেন।

আর এক বীরাঙ্গনার নাম সত্যবতী। তিনি ঠিক করেছিলেন সরাসরি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যোগ দেবার চেয়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করবেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা তাঁর ভূমিকাকে একাধারে 'অ্যাক্টিভ' ও 'সাপোর্টিভ' দুই বলতে পারি! সত্যবতী বিয়ের তিন বছরের মাথায় বিধবা হন। তাঁর এই অকাল বৈধব্যের সুযোগ যথারীতি বহু মানুষরূপী পশু নিয়েছিলেন! শেষ পর্যন্ত দেহপসারিণীর জীবন বেছে নিতে বাধ্য হন। একরাশ কষ্ট, যন্ত্রণা ও নির্যাতনের অসীম ইতিহাস! যার শুরু আছে কিন্তু শেষ কোথায় কে জানে!

সত্যবতী থাকতেন নন্দীগ্রামের নিকটবর্তী তেরপেখিয়া বাজারে। প্রতি রাতে তাঁর সঙ্গে রাত্রিবাস করতে বহু পুলিশকর্মী, থানার দারোগা, অফিসাররা আসতেন। ছলে-বলে-কৌশলে তাঁদের মুখ থেকে গোপন নানা তথ্য তিনি সংগ্রহ করে স্থানীয় বৈপ্লবিক গোষ্ঠীকে তা জানাতেন। স্থানীয় বহু বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী তাঁর এই তথ্যের কারণে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। তবে ধীরে ধীরে সত্যবতীর এই কার্যকলাপের খবর পুলিশের কাছে ফাঁস হতে থাকলো। সত্যবতী পিছু হটেননি। তিনি গোপনে এই কার্যকলাপ চালিয়ে যান। এরপর স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ যোগদান করেন। কখনো মদের দোকানে পিকেটিং কখনো-বা লবণ সত্যাগ্রহে সক্রিয় যোগদান করেন। তবে ভাগ্যের চরম পরিহাসে ১৯ আগস্ট ১৯৩২ সালে একটি স্থানীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। সোনালি দত্ত তাঁর 'মুক্তিসংগ্রামে বাঙ্গলার উপেক্ষিতা নারী' গ্রন্থে বর্ণনা দিয়েছেন এই বিষয়ে। সফোজ্জল নামে এক পুলিশ অফিসার তাঁর চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় এক অজ্ঞাত স্থানে, সেখানে মাটিতে ফেলে তাকে পদাঘাত করতে থাকে। চলতে থাকে নির্মম নির্যাতন। অবশেষে তা সহ্য করতে না পেরে সত্যবতী জ্ঞান হারান! সেই অজ্ঞান অবস্থাতেও অত্যাচার বন্ধ হয়নি। হাসপাতালে ডাক্তারি পরীক্ষায় দ্বারা দেখা যায় শরীরে অসংখ্য আঘাত এবং রেচনাঙ্গ একেবারে ক্ষতবিক্ষত! শেষমেশ মৃত্যু আসে!

ইতিহাস একরকম হারিয়ে ফেলেছে এই তিন কন্যাকে। নিজের জীবনকে অকাতরে ব্যয় করেছেন অথচ যেখানে ছিল না কোনো ক্ষুদ্রস্বার্থের আঁশটে গন্ধ। অথচ ইতিহাসের পাতায় উপেক্ষিতা হয়ে রয়েছেন। লুপ্ত, অর্ধসত্য, জঞ্জালময়, আবর্জনাময় ইতিহাসের জাল কেটে সত্য উদ্ভাসিত হোক— এই কামনা করি। □

ফুল আমাদের সবার প্রিয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফুলের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন তাঁর একটি গানের কলির মধ্য দিয়ে—'নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে/ তারই মধু কেন মনমধুপে খাওয়ায় না ...'। কবি ফুলের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করেছেন এক অপার্থিব সৌন্দর্য ও পবিত্রতা। ফুলের অপরূপ রং, মন মাতানো গন্ধের মধ্যে কবি খুঁজে পেয়েছেন জীবনে বেঁচে থাকার আনন্দ। সত্যিই তো। এক মানবশিশু জন্মালে আমরা তাকে ফুলের সঙ্গে তুলনা করে বলি, ' দেখো, শিশুটি কেমন ফুলের মতো নিষ্পাপ'। ইংরেজ কবি শেক্সপিয়ার বলেছেন, ' যে মানুষ ফুল আর গান ভালোবাসে না, সে নির্দ্বিধায় মানুষ খুন করতে পারে'। তাই ফুল নিষ্পাপ সৌন্দর্য ও পবিত্রতার অন্যতম প্রতীক। শুধু মানুষ কেন, দেব-দেবীর পূজার্চনা করার সময় ফুল ছাড়া হয় না। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক দেব-দেবীর পছন্দের ফুল রয়েছে। তাঁরা সেই ফুলে পুজো পেলে প্রসন্ন হন। বিষ্ণুপুরাণে আছে অশোক ফুল দিয়ে শ্রীহরির পুজো করলে রোগ নাশ হয়। ধুতরা মহাদেবের প্রিয় ফুল। মহাদেবের পুজোয় আবার শ্বেত জবা নিষিদ্ধ। রক্তবর্ণ পুষ্প দ্বারা পুরুষ দেবতা পুজো নিষেধ। আবার রক্তজবা মা কালীর বড়োই প্রিয় ফুল। নীল পদ্ম মা দুর্গার প্রিয়। কেতকী ফুলে শিবের পূজা নিষিদ্ধ।

প্রত্যেক দেব-দেবীর রয়েছে প্রিয় ফুল। তাই যে দেবতার যে ফুল প্রিয়, সেই দেব-দেবীকে সেই ফুল দিয়ে পূজা করলে পূজা সার্থক হয়, দেব-দেবীর পূজার্চনায় যেমন ফুল অপরিহার্য, তেমনই বৈবাহিক কর্মকাণ্ডে, নিত্যদিনের যেকোনও শুভকর্মে ফুল ছাড়া চলে না। লেখক ও কবিরা ফুলকে ঈশ্বরের অমূল্য দান বলে বর্ণনা করেছেন। মোটকথা, ফুলের সঙ্গে জীবনের এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের কাছে ফুল একটি জীবন্ত চৈতন্য সত্তা ও পবিত্রতার প্রতীক। ফুল সকলকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে শেখায়। বৈদিক ঋষিরা বলেছেন, ফুল হলো বোধ, সমতা ও শান্তির প্রতীক। মা সারদা বলেছেন, পুষ্প শান্তির প্রতীক। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও সর্বদা পুষ্পবেষ্টিত হয়ে থাকতে ভালোবাসতেন।

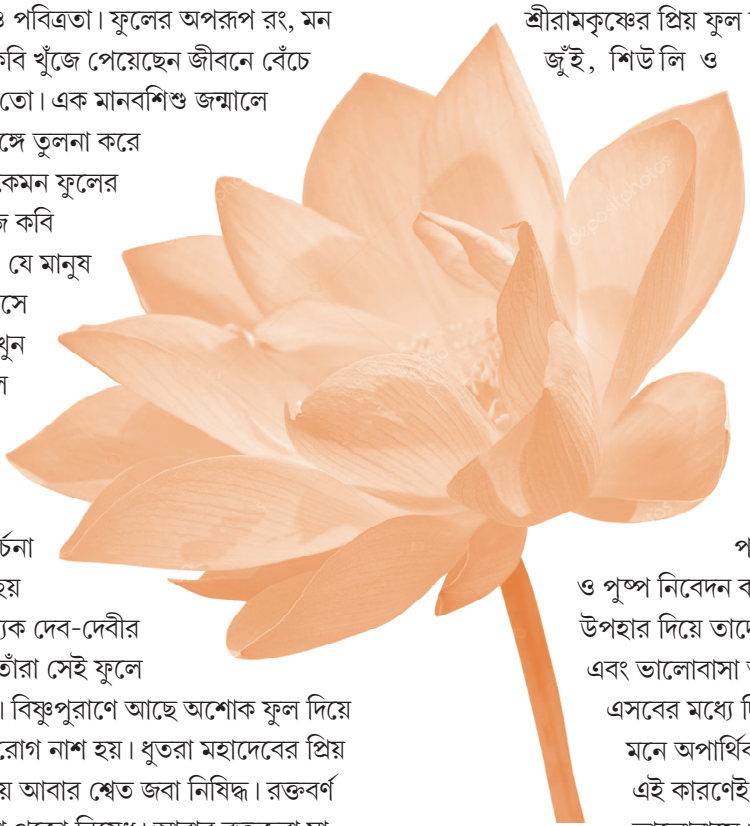

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় ফুল ছিল চাঁপা, মাল্লিকা, জুঁই, শিউলি ও গুলচী ফুল। দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরের আশেপাশে বিশেষত গঙ্গার ধারের বাগানে নানা রকমের ফুলে সর্বদা ভর্তি থাকে।

ছোটো বন্ধুরা, মনে রেখো, ফুলগাছ লাগানো , যত্ন করা, ফুল তোলা, মালা গাঁথা, দেব-দেবীর পায়ে ফুল দিয়ে সাজানো ও পুষ্প নিবেদন করা, প্রিয়জনদের ফুল উপহার দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটানো এবং ভালোবাসা আদানপ্রদান করা — এসবের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের মনে অপার্থিব শান্তিলাভ হয়। আর এই কারণেই ফুল সবাই ভালোবাসে। ফুল আমাদের মনে শুভবোধ জাগ্রত করে, সকলকে সমানভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শেখায়। ফুল মানুষের মধ্যে আত্মবোধ জাগরণের অন্যতম প্রতীক। ফুলকে ভালোবাসলে আমাদের কাউকে দুঃখ দিতে, কটু কথা বলতে বা আঘাত করতে ইচ্ছে করবে না। ছোটো বন্ধুরা, ফুলকে ভালোবেসে তোমরা জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে নাও। তাহলে সবসময় উচ্চ মননশীলতা আনন্দময় অবস্থায় থাকতে পারবে। কবি প্রিয়ংবদা দেবী লিখেছেন, 'জীবন আমার করো ফুলের মতন, শোভার আধার/ পবিত্র সুগন্ধে যেন সবাকার মন, তুষি অনিবার।'

বিশ্বজিৎ সাহা

ভারতের বিপ্লবী

গোপীনাথ সাহা

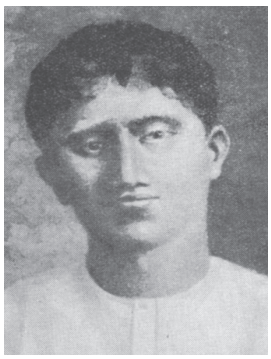

গোপীনাথ সাহা ছিলেন ভারতবর্ষের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ও অগ্নিযুগের বিপ্লবী। তিনি তরুণ বিপ্লবীদলের সদস্য ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিদ্যালয় ত্যাগ করে ক্রমে হুগলী বিদ্যামন্দির, কলকাতা শ্রী সরস্বতী লাইব্রেরি ও সরস্বতী প্রেস, দৌলতপুর সত্যাশ্রম, বরিশাল শঙ্কর মঠ, উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি বিপ্লবী সংগঠনে বিভিন্ন নেতার সঙ্গে কাজ করেন। ১৯২৪ সালের ১২ জানুয়ারি কলকাতার চৌরঙ্গিতে অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করতে এসে ভুলবশত অন্য একজনকে গুলি করে হত্যা করেন। গ্রেপ্তারের পর আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকৃত হন এবং টেগার্ট হত্যাই উদ্দেশ্য ছিল একথা স্বীকার করেন। বিচারে ১ মার্চ ১৯৪২ সালে তাঁর ফাঁসি হয়। ওই দিন দেশের সর্বত্র শোকসভা হয়।

জানো কি?

- নয়া দিল্লির পুরনো নাম ইন্দ্রপ্রস্থ।
- পৃথিবীর দীর্ঘতম হ্রদ আফ্রিকার টাঙ্গানিকা
- আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় মগধের রাজা ছিলেন ধননন্দ।
- রেডিয়েশন পরিমাপ করতে ডোসিমিটার ব্যবহৃত হয়।
- সামবেদে ১৬০৩টি শ্লোক আছে।
- ঋকবেদে ১০২৮টি সূক্ত আছে।
- গোত্রের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় অথর্ববেদে।
- ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা মেহেরগড়।

ভালো কথা

মা ইঁদুর

বর্ষা শেষ হয়ে গেলেও এবার বৃষ্টির যেন বিরাম নেই। গত রবিবার দুপুরে এত বৃষ্টি হলো যে আমাদের আমগাছের গোড়া পর্যন্ত জলে ডুবে গেল। তখনও বৃষ্টি পড়ছে। ভাই দৌড়ে এসে আমাকে বলল, দিদি একটা জিনিস দেখবি আয়। আমি বাইরে গিয়ে দেখলাম একটি বড় ইঁদুর আমগাছের গোড়ায় জলের মধ্যে ডুব দিয়ে ছোটো ছোটো ইঁদুরের বাচ্চা মুখে করে নিয়ে এসে আমাদের গোয়ালে খড়ের মধ্যে রেখে আবার দৌড়ে গিয়ে আর একটা বাচ্চা নিছে আসছে। আমরা অবাক হয়ে দেখছিলাম। মা ইঁদুরটি আমাদের দেখে একটুও ভয় করছিল না। ভাই বলল ১১টা এনে রেখেছে। ঠাকুমাকে এটা বলতেই ঠাকুমা বলল , পৃথিবীর সব মায়েরাই এরকম।

স্নেহা সরকার, দ্বাদশ শ্রেণী, দৌলতপুর, দঃ দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

মা আসছে

আদৃতা সরকার, নবম শ্রেণী, গাজোল, মালদা।

কাশ দুলছে শিউলি ফুটছে
ধানখেতে দোলা লাগছে
দিঘিতে পদ্ম ফুটছে।

দুদিন পরে মা আসছে
আকাশ বাতাস তাই হাসছে
ধরিত্রী মা-ও তাই সাজছে।

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

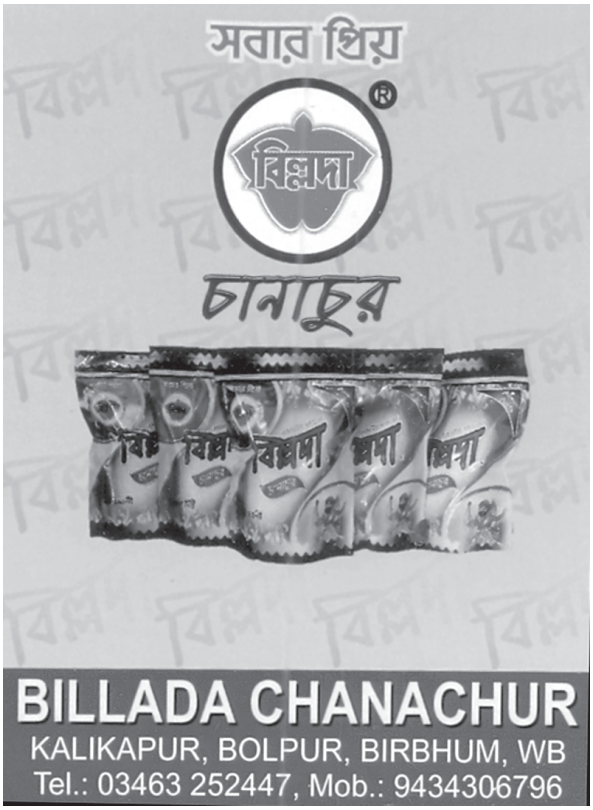

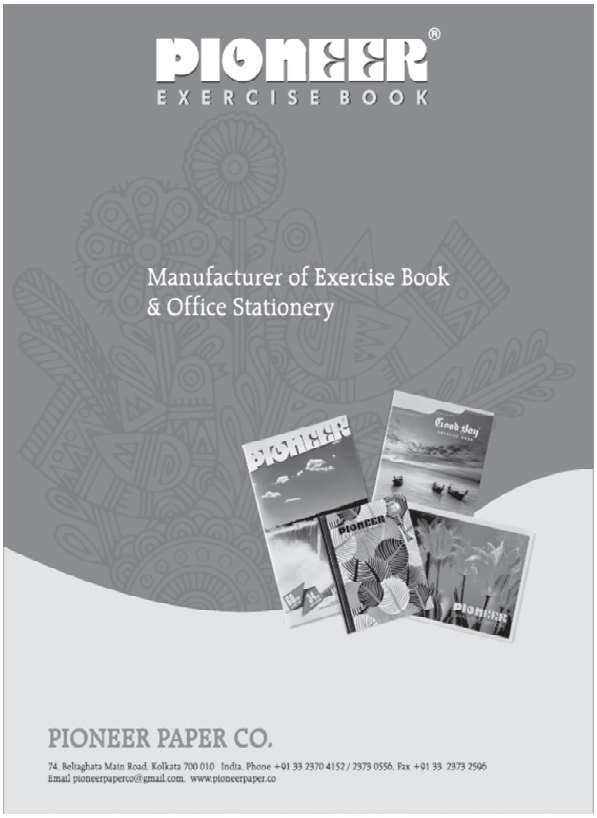

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব
কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সর্বভারতীয় রাজনীতির জল ঘুলিয়ে মাছ ধরতে চাইছে তৃণমূল

সর্বভারতীয় রাজনীতিতে একটা অভূতপূর্ব সমীকরণ দেখা যাচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত অর্থাৎ মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভোটের সময় বিরোধীরা এক হওয়ার চেষ্টা করে, কার্যগতিকে কোনোবারই এক হতে না পারলেও বা কিছু ক্ষেত্রে বিরোধীরা সাফল্যের মুখ দেখলেও 'একের বিরুদ্ধে এক'-এর স্লোগান কোনোকালেই বাস্তবায়িত হয়নি। এবং জোটের ক্ষেত্রে কংগ্রেস নেতৃত্বের অবিসংবাদিত একটা মান্যতা ছিল।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেস নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ তলানিতে গিয়ে ঠেকে। এখন দেখা যাচ্ছে, কিছুদিন হলো এরাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকেই তৃণমূলের নবনিযুক্ত সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুযোগ পেলেই কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেছেন, বিশেষত, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত হলে তিনি যে 'কংগ্রেসের মতো পালাবেন না' একথাটাই ঠারেঠোরে অনেকবার বলার চেষ্টা করেছেন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আন্দোলন গড়ে তুলবার ব্যর্থতাও ক্রমাগত মনে করিয়ে অভিষেক বলেছেন, রাস্তায় কংগ্রেস নয়, আছে তৃণমূলই। এতে রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব তো বেজায় চটেছেনই, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চটলেও তাঁদের অবস্থা এখন এতটাই করুণ যে রাগ প্রকাশের ক্ষমতাও তাঁদের নেই, তাই কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হচ্ছে তাঁদের। অর্থাৎ চুপ করে থাকতে হচ্ছে বা সামান্য কিছু বলেই তাঁদের তর্জনগর্জন শেষ করতে হচ্ছে।

দেশবাসী দেখেশুনে তাজ্জব বনে যাচ্ছিলেন, অভিষেক ইচ্ছাকৃতভাবে বিরোধী জোটের ফাটল কেন আরও চওড়া করছেন! একি তাঁর অপরিণত রাজনৈতিক মস্তিষ্কের ফল? যদিও মমতা ব্যানার্জিও তো তাঁর সুরে তাল মেলাচ্ছিলেন। কিন্তু একথা আমাদের ভুললে চলবে না, বর্তমান তৃণমূল দল পরিচালিত হয় প্রশান্ত কিশোরের কুটবুদ্ধিতে।

সেই কুটবুদ্ধিরই ফল সম্ভবত, মমতা ব্যানার্জির সাধ জেগেছে, সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপি বিরোধিতার পরিসরে একমাত্র মুখ হিসেবে কেবল তাঁরই অস্তিত্ব থাকবে। লক্ষ্য অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী হওয়া। মনে থাকতে পারে, মমতার এই 'স্বপ্ন' নতুন নয়। গত লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে, ব্রিগেডের জনসভায় সারা দেশের বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ডেকে মমতা দেশজুড়ে মোদী হঠানোর ডাক দিয়েছিলেন। ফলাফল কী হয়েছিল সকলেই জানেন। সেই লোকসভা নির্বাচনের পর কংগ্রেসের হাঁড়ির হাল হয়েছিল। এখন যার বুদ্ধিতেই হোক, তৃণমূল সেই সুযোগটা নিতে চাইছে। অসমের কংগ্রেস সাংসদ সন্তোষমোহন দেবের মেয়ে সুস্মিতা দেব, গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লুইজিনহো ফেলেরিও-র কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান এই সহজ চিত্রনাট্যেরই অঙ্গ। যে কংগ্রেস ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে, এই অবস্থায় বিজেপি বিরোধিতার পালে হাওয়া দিতে কংগ্রেসি ঘরানার তৃণমূলই ভরসা। কারণ কারণ তৃণমূলের আঞ্চলিক কিছু সাফল্য। নয়তো মমতা কিংবা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতা ছিল না নিজস্ব ক্ষমতায় অসমে বা গোয়ায় সংগঠন বিস্তার করার। এখন প্রশ্ন, সুস্মিতা বা ফেলেরিও সব জেনেবুঝে এরকম একটা দলে ভিড়লেন কেন? প্রথমত, কিছু পাওয়ার আশায় তো বটেই। যেমন সুস্মিতা রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছেন। কিন্তু এঁরা খুব ভালোভাবেই জানেন, তৃণমূল যে সংগঠন বিস্তারের উদ্দেশে এঁদেরকে নিজেদের দলে প্রশ্রয় দিচ্ছে, তা আর যাই হোক এঁদের দিয়ে সাধিত হওয়ার নয়। আর বাঙ্গলার কিছু আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেস ছেড়ে আসা সব নেতাকে তুষ্ট করা যাবে না। আসলে প্রশান্ত কিশোর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাজনীতির জলটা ঘুলিয়ে দিতে চাইছেন। কারণ নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ নিজেদের যে উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন, সেই উচ্চতায় বাস্তবের মাটিতে কোনো বিরোধী নেতারই উঠে আসা কার্যত অসম্ভব। সর্বভারতীয় স্তরে এই যে ভ্যাকুয়ামটা (শূন্যতা), এটা পূরণ করার জন্য মমতা ব্যানার্জিকে সামনে রেখে একটা মায়াবী বিভ্রম তৈরি করতে চাইছে প্রশান্ত কিশোর আর তার দলবল। সেই পরিকল্পনার আরও কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যেমন বাঙ্গলায় কট্টর বিজেপি-বিরোধী বলে পরিচিত এক উচ্চপদস্থ আমলা, যিনি নকশালি চিন্তার জগৎটাও অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম, তাঁকেও রাজ্যসভায় পাঠানো হয়েছে, শুধু গলার জোরে বিজেপি বিরোধিতাটুকু প্রদর্শন করার জন্য। এর একটা লক্ষ্য তো অবশ্যই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সর্বভারতীয় রাজনীতির মুখ করে তোলা। নিজের যোগ্যতায় তাঁর এই উচ্চতায় পৌঁছনোর ক্ষমতা নেই, সেটা সম্ভবত অভিষেক নিজেও জানেন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সর্বভারতীয় রাজনীতির মুখ করে তোলাই লক্ষ্য। নিজের যোগ্যতায় তাঁর এই উচ্চতায় পৌঁছনোর ক্ষমতা নেই, সেটা সম্ভবত অভিষেক নিজেও জানেন।

ফঃ ৬

কৃষি বিভাগ

ত্রিপুরা সরকার

ধলাই, ত্রিপুরা

মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা 'সয়েল হেলথ কার্ড— একটি উল্লেখযোগ্য দিশা।

.... সয়েল হেলথ কার্ড কেন?

১। জমির ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থা জানা যাবে।

২। ফসলভিত্তিক প্রয়োজনীয় সার ও অনুখাদ্য সঠিক পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যাবে।

৩। মাটির গঠন ও গ্রথন জেনে প্রয়োজনে ভৌত অবস্থার উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করা যাবে।

৪। জমির উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতা সুরক্ষিত রাখা যাবে।

৫। ফসল ও জমিকে অতি কিংবা অল্প মাত্রায় রাসায়নিক সার প্রয়োগের কুফল থেকে রক্ষা করা যাবে।

৬। জমির মাটি অম্ল বা ক্ষারধর্মী হলে তা সংশোধন করা যাবে।

৭। সর্বোপরি সয়েল হেলথ কার্ড অনুসরণ করে পরিবেশ দূষণ রোধেও আপনি অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

... আপনার জমির মাটি পরীক্ষার জন্য নিকটবর্তী কৃষি সেক্টর অফিস / গ্রামসেবক কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

ত্রিপুরা সরকার, কৃষি বিভাগ
ধলাই জেলা

জনগণই পারে দলবদলুদের উচিতশিক্ষা দিতে

মণীন্দ্রনাথ সাহা

কয়েকদিন আগে আসানসোলের সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়র মুখে শোনা গেছে 'খেলার' কথা। তৃণমূলে যোগ দিয়ে তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'আমি প্লেয়িং ইলেভেনেই থাকতে চাই। খেলার সুযোগ না পেয়ে বিজেপি ছেড়েছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে একাদশে রাখার জন্য।'

কে এই বাবুল সুপ্রিয়? বাবুল সুপ্রিয় পূর্বে তৃণমূলের সংসারে ছিলেন, পরে ঘর বদল করে বিজেপির ঘরে আশ্রয় নেন। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটের প্রচারে আসানসোলের সভায় নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন— 'পার্লামেন্ট মে মুঝে বাবুল চাহিয়ে।' তৎকালীন নরেন্দ্র মোদীর ইচ্ছা পূরণের ডাকে সাড়া দিয়ে পরপর দু'বার বাবুলকে পার্লামেন্টে পাঠিয়েছিলেন আসানসোলবাসী। মুম্বইয়ের সংগীত শিল্পী বাবুল সুপ্রিয় ২০১৪ সালে প্রথমবার আসানসোল থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েই নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রীসভায় জায়গা পেয়েছিলেন। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি আসানসোল থেকে জয়ী হয়ে পুনরায় মন্ত্রী হন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ব্যাপক রদবদল হওয়ায় এবং বাবুল সুপ্রিয় মন্ত্রী হয়ে আশানুরূপ কাজ না করায় মন্ত্রিত্ব থেকে বাদ পড়েন।

মন্ত্রিত্ব চলে যাওয়ার পরই তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের ক্ষোভ উগরে দেন। সেখানে তিনি লেখেন, তিনি রাজনীতি ছেড়ে দিচ্ছেন। পরে সাংসদ পদও ছেড়ে দেবেন। কিন্তু বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে বিষয়টি মিটে যায়। তখন তিনি বলেছিলেন, 'রাজনীতি থেকে অব্যাহতি নিলেও তিনি সাংসদ পদে থাকবেন। অন্য কোনো দলে যোগ দেবেন না।' কিন্তু তিনি হঠাৎ করেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে যোগ দিলেন তৃণমূলে।

বাবুল তার পুরনো সংসারে ফিরে যাওয়ায় বিজেপির প্রাক্তন রাজ্যসভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছেন, 'বাবুল দলে থেকেও লাভ হয়নি, আর চলে গেলেও ক্ষতি হবে না। দল দলের মতোই চলবে। রাজনৈতিক পর্যটকেরা আসবেন, ঘুরে ফিরে চলে যাবেন।' দিলীপ ঘোষ আরও বলেছেন, 'কে কোথায় গেল, তা নিয়ে কিছু যায় আসে না। আমাদের কোনও ধাক্কা নেই। যারা ধাক্কা খাচ্ছে, তারাই সরে যাচ্ছে। অনেকেই আসছে যাচ্ছে।'

> **"ভারতীয় সংবিধানে গণতান্ত্রিক অধিকারের নামে 'যা ইচ্ছা তাই করার' সুযোগ নিয়ে যারা নিজেদের কালিমালিপ্ত করছেন, তাঁদের সম্পূর্ণভাবে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া দরকার জনগণের পক্ষ থেকে। সে যে দলেরই দল বদলু হোক না কেন। আইন-আদালত-রাজনৈতিক দল কেউ এদের সবক শেখাবে না। এদের একমাত্র সবক শেখাতে পারেন জনগণ।"**

বাবুল সুপ্রিয়কে লক্ষ্য করে গ্রামে-গঞ্জের সাধারণ মানুষ যেসব কথা বলছেন সেই কথাগুলো এখানে লেখার জন্য প্রথমেই পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তাঁরা বলছেন— 'কলকাতার সোনাগাছিতে, শান্তিপুরে এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এক শ্রেণীর মানুষ বাস করেন যাঁরা রোজগারের জন্য নিজেকে বিক্রি করে। তাঁদেরকে বলা হয় বারাঙ্গনা, দেহপসারিণী বা যৌনকর্মী। তা তাঁরা যতই ঘৃণার কাজ করেন না কেন তবুও তাঁদের মধ্যে সততা আছে। কী সেই সততা? তাঁরা এ রাজ্যের তথাকথিত কিছু এলিটদের মতো বাকচাতুরি না করে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় মুখের ওপর বলে দেন— 'ফেল কড়ি মাখ তেল, আমি কী তোমার পর?' অর্থাৎ টাকা দাও, মজা লোটো। অধিকাংশ মানুষ রাজনৈতিক দল বদলুদের রাজনৈতিক বারাঙ্গনা বলে মনে করছেন। এঁরা মুখে বড়ো বড়ো বুলি আওড়াবে অথচ ঠিক তার বিপরীত কাজ করবে।

এই বাবুল সুপ্রিয় এবারের ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেছিলেন--- 'বাঙ্গলায় যদি কেউ সাম্প্রদায়িক থেকে থাকেন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' তাছাড়াও বাবুল ভোটের আগে নিজে গান বেঁধেছিলেন তৃণমূলকে কটাক্ষ করে। সেই গানটি সাধারণ মানুষকে আনন্দ বিতরণ করেছিল। তা হলো— 'ফুটবে এবার পদ্মফুল বাঙ্গলা ছাড়ো তৃণমূল। এই তৃণমূল আর নয় আর নয়' ইত্যাদি। অথচ দেখুন, সেই বাবুল দল বদলের পরেই বলছেন— 'সবচেয়ে পপুলার মানুষকে চব্বিশে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই। মমতার জনপ্রিয়তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রিত্বের মুখ ছিলেন নরেন্দ্র মোদী। এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সময় বদলেছে।

তাহলেই দেখুন, সাধারণ লোকেরা তাঁকে নিয়ে যে মন্তব্য করছেন তাতে তাঁদের

PRATIMA DECORATORS & SOUND

Prop. Madhab Roy

A. A. Road, Ambassa, Dhalai, Tripura

M. : 09402330156, 09436173228

All Kinds of Decorating Items, Cataring, Lights, Video Recording, Orgester, C.C. Tv, Projector, LED Tv, Nescafe etc. are available here on rental basis.

SRI MADHAB ROY

Ambassa, Dhalai, Tripura, Pin - 799289

(Govt. Enlisted Contractor & Order Supplier)

GSTIN NO. 16BCOPR8006C1ZK, PAN : BCOPR8006C

LABOUR L/NO. AMB/1003/CL/18, ENLIST NO. SE-V/ 271(CIVIL) OF 16/05/2018

দোষ দেওয়া যায় না। গাছে ঝুলে থাকা এক ধরনের প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করে কেউ কেউ বলছেন— 'এরা বাদুড়ের জাত। যে মুখ দিয়ে খায়, সেই মুখ দিয়েই মলত্যাগ করে। এরকমই নিকৃষ্ট জাতের প্রাণী এঁরা।'

যাইহোক, দল বদল যে শুধু বাবুল সুপ্রিয় একা করেছেন তা নয়। এর আগে দল বদলের খেলা ব্যাপক ভাবে শুরু করেছিলেন, তৃণমূলের মুকুল রায়। ২০১১ সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূল বিপুলভোটে জেতার পর মুকুল রায় দল ভাঙানোর খেলায় সকলকে চমকে দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের বড়ো বড়ো নেতা-বিধায়ক-সাংসদদের তিনি তৃণমূলে এনেছিলেন। এমনকী সিপিএমের রেজ্জাক মোল্লার মতো নেতাকে এবং আরও কয়েকজন বামপন্থী নেতাকে জোড়া ফুলের পতাকা ধরিয়েছিলেন। আর দলবদল করেই তাঁরা কেউ কেউ উচ্চপদ কেউ মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন। অথচ মুকুল রায় তৃণমূল ত্যাগ করে বিজেপিতে চলে গেলেন। সেখানেও তিনি তৃণমূল থেকে দল ভাঙিয়ে অনেককে নিয়ে গিয়েছিলেন বিজেপিতে। ২০২১-এর ভোটে তৃণমূল জিতে যাওয়ায় প্রথমেই সেই মুকুল রায় এবং তাঁর ছেলে শুভ্রাংশু রায় বিজেপি ছেড়ে পুনরায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদাশ্রিত হলেন। এবং রং বদল করেই তিনি যাদের বিজেপিতে নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের পুনরায় তৃণমূলে ফিরিয়ে আনা শুরু করেছেন। তাহলে এদের বাদুড় বা বারাঙ্গনা বলে যে আমজনতা অভিহিত করছেন তাতে তাঁদের কি দোষ দেওয়া যায়? অন্যান্য বিষয়ের যেমন একটা সীমারেখা আছে তেমনি নির্লজ্জতারও একটা সীমা থাকা উচিত। এদের তা নেই।

একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়— এই দল বদলকে কেন্দ্র করেই 'আয়ারাম গয়ারাম' শব্দটি আবার খুব আলোচনায় এসেছে। এই শব্দটি ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে প্রথম ব্যবহার শুরু হয় ১৯৬৭ সালে। ৮১ সদস্য বিশিষ্ট হরিয়ানা বিধানসভার হাসনপুর কেন্দ্র থেকে গয়ালাল নামে এক ব্যক্তি নির্দল হিসেবে নির্বাচিত হন। নির্বাচনের আগে কেউ তাঁকে দলীয় মনোনয়ন দিতে রাজি হয়নি। ভোটে জেতার পর তাঁকে নিয়ে টানাহেঁচড়া শুরু হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি কংগ্রেস ছেড়ে সংযুক্ত মোর্চায় যোগ দেন। আবার কয়েক ঘণ্টা যেতেই তিনি ফিরে আসেন কংগ্রেসে। তখন কংগ্রেস নেতা— রাও বিজেন্দর সিংহ গয়ালালকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে রসিকতা করে বলেছিলেন, 'গয়ারাম অব আয়ারাম হ্যাঁয়।' এ থেকেই শব্দটির প্রচলন।

দ্বিতীয় ঘটনাটিও ঘটেছিল হরিয়ানাতেই। ১৯৭৯ সালে ভজনলাল জনতা পার্টির সরকার গড়েছিলেন রাজ্যে। কিন্তু ১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ায় ভজনলাল তাঁর পুরো সরকারের ভোল পালটে অনুগামী বিধায়কদের নিয়ে কংগ্রেস হয়ে যান। ভারতীয় রাজনীতিতে ভজনলাল 'আয়ারাম গয়ারামে'র প্রতীক হয়ে ওঠেন।

অল্প কিছুদিন আগে মহারাষ্ট্রে বিজেপি-শিবসেনা জোট ভেঙে যাওয়ার পর মারাঠা রাজনীতির অন্যতম প্রবাদ পুরুষ শরদ পাওয়ারের ভ্রাতুষ্পুত্র অজিত পাওয়ার বিজেপির দেবেন্দ্র ফড়নবিশের নেতৃত্বে উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। কিন্তু ৮০ ঘণ্টার মধ্যেই বিজেপি ছেড়ে শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরের ডেপুটি হিসেবে শপথ নিলেন। পশ্চিমবঙ্গ আয়ারাম গয়ারাম রাজনীতি থেকে মুক্ত ছিল। কিন্তু গত এক দশক ধরে এরাজ্যেও সুবিধাবাদী রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছে।

বিজেপির যে সমস্ত কর্মী বাবুলকে ভোটে জেতানোর অপরাধে তৃণমূলি গুন্ডাদের হাতে মার খেয়ে, বিষয় সম্পত্তি হাতছাড়া করে পরিবার পরিজন নিয়ে নিজবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়ে অন্যস্থানে বা অন্যরাজ্যে প্রাণ বাঁচানোর জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের বাবুল তিন মাসের মধ্যেই ভুলে গিয়ে একটা আপাদমস্তক দুর্নীতিপরায়ণ দলে যোগ দিলেন দুর্নীতি করে লুটেপুটে খাওয়ার জন্য। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন ওই সমস্ত কর্মীর প্রতি সদয় হয়ে তাঁদের সুস্থ রাখেন, বিপদে রক্ষা করেন। এই নামি-দামি বজ্জাতগুলো দলের আবর্জনা। আবর্জনা যত বেরিয়ে যাবে ততই দলের মঙ্গল।

ভারতীয় সংবিধানে গণতান্ত্রিক অধিকারের নামে 'যা ইচ্ছা তাই করার' সুযোগ নিয়ে যারা নিজেদের কালিমালিপ্ত করছেন, তাঁদের সম্পূর্ণভাবে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া দরকার জনগণের পক্ষ থেকে। সে যে দলেরই দল বদলু হোক না কেন। আইন-আদালত- রাজনৈতিক দল কেউ এদের সবক শেখাবে না। এদের একমাত্র সবক শেখাতে পারেন জনগণ নামক বিচারকেরা।

তাঁদের উচিত আগামীদিনে যে কেউ যে কোনো দল ত্যাগ করে অন্য দলে যোগ দিয়ে ভোটের প্রার্থী হলে সমস্ত ভোটার একমত হয়ে ভোট নামক পদাঘাতে এদের দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। তবেই এদের নোংরামি বন্ধ হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে কলুষিত রাজনীতি নিষ্কলুষ হবে এবং এদের বারাঙ্গনা সাদৃশ্য ভূমিকা গ্রহণও বন্ধ হবে। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক, প্রচার প্রতিনিধি, পাঠক-পাঠিকাদের জানানো হচ্ছে যে, পূজাবকাশের জন্য স্বস্তিকা পত্রিকা ১৮ ও ২৫ অক্টোবর প্রকাশিত হবে না। ১ নভেম্বর থেকে যথারীতি প্রকাশিত হবে।

— স্বঃ সঃ

বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত 'স্বস্তিকা ডিজিটাল' বিভাগটি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

www.eswastika.com

ওয়েবসাইটে যেমন প্রতি সপ্তাহে স্বস্তিকা পাওয়া যেত সেটা যথারীতি চালু থাকবে। —স্বঃ সঃ

সিন্ধু সভ্যতা কি বহিরাগত আর্য আক্রমণে ধ্বংস হয়েছিল ?

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

প্রথম পর্ব

ঋগ্বেদের কাল ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বের অনেক আগে

বহু চর্চিত ঔপনিবেশিক তত্ত্ব হলো ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মধ্য এশিয়া থেকে বর্বর আর্যরা ভারতে ঢুকে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো নগরগুলোকে ধ্বংস করে এবং তথাকথিত দ্রাবিড়দের পূর্বপুরুষ এই সিন্ধু সভ্যতার নগরবাসীদের কচুকাটা করে তাদের দক্ষিণ ভারতে বর্তমান তামিলনাড়ুতে পাঠিয়ে দেয়। এই ব্যাখ্যা বা গল্প কতটা সত্যি?

সমুদ্রের তলায় খনন কাজ চালিয়ে এটা ধরা পড়েছে যে ১৪০০ খ্রিস্টপূর্ব দ্বারকা নগর সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যায়। কৃষ্ণের মৃত্যুর পরে এই ঘটনা ঘটে বলে মহাভারত ও হরিবংশ সাক্ষ্য দেয়। কৃষ্ণের মৃত্যুর অল্প আগে মানে ১৪০০ খ্রিস্টপূর্ব নাগাদ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মাত্র ১০০ বছর আগে, মানে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বে আক্রমণকারী আর্যদের দ্বারা হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনেক আগে ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল। সুতরাং 'আর্যআক্রমণতত্ত্ববাদী'রা যে বলছেন ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বে আর্যরা ভারত আক্রমণ করে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস করেছিল, তার অনেক আগে ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল। ঋগ্বেদকে হরপ্পা সভ্যতার আগে রাখতেই হবে।

পার্পোলা বলে একজন বলেছেন ঋগ্বেদীয় আর্যরা বর্তমান পাকিস্তানের সোয়াত থেকে পঞ্জাবে গমন করেছিল ১৬০০-১৪০০ খ্রিস্টপূর্বে; মিতানি চুক্তি ও কিক্কুটি রথের ঘোড়া প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের উপর ভিত্তি করে তিনি একথা বলেছেন। কিন্তু কোনো নথিতেই আর্য শব্দটা নেই। এমনকী ঋগ্বেদে উল্লেখ করা দেবতাদের অনুযায়ী নামও নেই। তিনি বলছেন মিত্তানি গোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে মধ্য ভারতের ভাষার মিল আছে, ইন্দো-ইরানীয় ভাষার সঙ্গে নয়। তিনি আরও বলছেন যে হরপ্পার লোকরা প্রোটো-দ্রাবিড়ীয় ভাষায় কথা বলত, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় নয়। কারণ সেখানে ঘোড়ার উল্লেখ নেই। অথচ তিনি বনস উপত্যকা ও মালোয়ার সংস্কৃতিকে আর্য বলছেন, যদিও সেখানেও ঘোড়া নেই। এটা পরস্পরবিরোধী। পিরাকের লোকরা যারা ঘোড়ায় চড়ত তারা ভারতে ঘোড়ার ব্যবহার শুরু করেছিলেন বলে তিনি বলছেন। কিন্তু পিরাকে কোনো ঘোড়ার হাড় মেলেনি। তিনি এও বলছেন সোয়াতে ঋগ্বেদীয় মানুষের উপস্থিতি ছিল, সম্ভবত সেখান থেকে ঘোড়া সম্পর্কে অবহিত জনগণ ভারতে আক্রমণ চালিয়েছিল আর সেটাই ছিল ঋগ্বেদীয় আক্রমণ। সোয়াতে ইঁটের নির্মিত আগুনের বেদী পাওয়া গেছে কিন্তু আর্যরা ইঁটের কথা জানতই না। এমনকী যে রুপোর কথা বলা হচ্ছে তাও ঋগ্বেদে নেই। অথর্ববেদের কালো ধাতু আসলে তামা ও টিনের অ্যালয়। তাকে পার্পালা লোহা বলেছেন। ঋগ্বেদের আয়াসহচ্ছে তামা, শতপথ ব্রাহ্মণে লোহা বা তামার কোনো ধারণা নেই। অতএব লৌহযুগের (১১০০ খ্রি.পূ.) অনেক আগে ঋগ্বেদ।

তারপর তিনি বলছেন সিন্ধু উপত্যকায় উত্তর-হরপ্পা পর্বে ধান চাষ ঋগ্বেদীয় আর্যত্বের আর একটা প্রমাণ। সিন্ধু উপত্যকার বাইরে ও ভিতরে হরপ্পার বেশ কিছু বাসস্থানে ধান ইতিপূর্বেই পাওয়া গেছে। ঋগ্বেদ ও অবেস্তায় তার উল্লেখ নেই।

ঋগ্বেদের কোনো কিছুতেই কোনো আক্রমণের কথা নেই। ঋগ্বেদে দেবতা ও ঋষিদের উল্লেখ আছে কিন্তু কোনো অনুপ্রবেশের কথা নেই। একটা শ্লোকে উটের উল্লেখ আছে মানে তার নিদর্শনও থাকতে হবে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আবার রুপো ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জ্ঞাত ছিল। অর্থাৎ আদিমতম ধান চাষের কথা ৬৮১০-৫৭৮০ খ্রিস্টপূর্বে

নিওলিথিক মহগোড়া ও কোল্ডিহোয়া উল্লেখ আছে। তালমেনার মিনারা সুমেরিয়া দখল করেছিল ৫৫০০ খ্রিস্টপূর্বে তখন ধান চাষ জানত না কিন্তু ঘোড়ার ব্যবহার জানত। সুতরাং 'বহিরাগত আর্যরা হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস করেছিল' এই তত্ত্ব ভুল।

দ্বিতীয় পর্ব

তাহলে হরপ্পা সভ্যতা কীভাবে ধ্বংস হলো?

(১) যমুনা নদী ছিল সরস্বতী নদীর একটা উপনদী। পরে তা গতিপথ পরিবর্তন করেছিল খুব বেশিভাবে এবং পরে তা গঙ্গানদীর সঙ্গে মিশেছিল। এইভাবে সরস্বতীকে হিমবাহের বরফগলা জল পাওয়া থেকে বঞ্চিত করেছিল। একথা বলা হয় যে আজ থেকে ৪৭০০ বছর আগে এক বিশাল টেকটনিক প্লেট শিফ্‌ট হয়েছিল। আর এর ফলে শিবালিক পর্বতমালায় এক বিশাল খাত সৃষ্টি হয়। এর কারণে যমুনা নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করে পশ্চিম থেকে পূর্বে সরে যায়, এটা তখন আরও গতিপথ পরিবর্তন করে গঙ্গা নদীর সঙ্গে মেশে, তা ঘটেছিল ৪৬০০ বছর আগে।

যোধপুরে অবস্থিত ইসরোর আঞ্চলিক রিপোর্ট সেন্সিং কেন্দ্রে কতকগুলো প্যালিও চ্যানেলের (প্যালিও-পুরনো, চ্যানেল— নদীগর্ভ বা প্রণালী।) নমুনা রয়েছে। প্যালিও চ্যানেল মানে হলো মরা বা বুজে যাওয়া নদীর অবশেষ যা নতুন চড়া পড়ে বুজে গেছে। কিন্তু তার নদীখাত সহজে মরে না সরস্বতী নদীর ক্ষেত্রে সেই পুরনো মরা নদীর খাত খুঁজে পাওয়া গেছে। পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত গবেষণা চালিয়েছেন তার মধ্যে ঘাঘর-হাকরাও ছিল। এই চ্যানেলগুলো হরিয়ানা, পঞ্জাব ও রাজস্থানে অবস্থিত। সব গবেষণায় এই প্যালিও চ্যানেলগুলোকে সরস্বতী নদী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি ও স্যাটেলাইট থেকে খুব শক্তিশালী ক্যামেরার সাহায্যে এখন মাটির নীচে চাপা পড়া নদীখাতের সম্পূর্ণ গতিপথ আবিষ্কার করা গেছে।

স্যাটেলাইট ছবির সাহায্যে সেই বিশাল প্যালিও চ্যানেলকে সরস্বতী নদী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পুরো সরস্বতী নদীর গতিপথই খুঁজে পাওয়া গেছে।

থর মরুভূমির বালির নীচে চাপা পড়া যে বিশাল নদীকে খুঁজে পাওয়া গেছে সেটাই সরস্বতী নদী বলে বৈজ্ঞানিকরা মত প্রকাশ করছেন দৃঢ়ভাবে।

(২) এই সরস্বতী নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল বিশাল সরস্বতী সভ্যতা— হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো সেইসব অসংখ্য নগর সভ্যতার মধ্যে দুটো মাত্র। অন্যদের মধ্যে আছে রাখিগাড়ি, ধোলাভিরা, কালিবঙ্গান ইত্যাদি। সরস্বতী নদী যখন ৩৮০০ আগে বছর শুকিয়ে যায় তখন থেকে এইসব নগর সভ্যতার ধ্বংস শুরু হয়।

(৩) মানুষজন পূর্বদিকে হিমালয়ের পাদদেশে সরে যেতে শুরু করে দেয়। বর্ষার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমতে থাকার ফলে খরা সৃষ্টি হয়। চাষের কাজের জন্য সেখানকার মানুষ বন্যার উপর নির্ভর করত। খরার ফলে সেচ বন্ধ হয়ে যায়। হিমালয়ের পাদদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হতো। তারপর সেগুলোও শুকিয়ে যায়, তখন শেষমেশ তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

(৪) মরুভূমি অঞ্চলের কারণে আর্কটিক অঞ্চল থেকে তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া ইউরোপে ও আটলান্টিকে ঢোকে। ভূমধ্যসাগরে ঝড় বাড়তে থাকে।

কিন্তু অন্যান্য কারণগুলো অতিরিক্ত হতে পারে; মূল কারণ ছিল সরস্বতীর নদীর মজে যাওয়া। স্থানীয় লোকগাথা অনুসারে বলা হয় যে একটা বিরাট বেগবান নদী মাটির নীচে চলে গিয়েছিল। রাজস্থানের জয়সলমির ছাড়িয়ে একটা জায়গা আছে বিনাশনা, যা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। সেই জায়গা থেকে সরস্বতী নদী লুপ্ত হয়ে মাটির নীচে চলে যায়। সরস্বতী নদী মাটির নীচে তিনটে খাতে বয়ে গিয়েছিল। তাদের গভীরতা ছিল একেক জায়গায় একেকরকম। সরস্বতী নদীর মজে যাওয়া খাত বরাবর পাতকুয়ো খুঁড়ে তার নীচ থেকে হাজার হাজার লিটার মিষ্টি জল পাওয়া গেছে। পুরনো দিনের ম্যাপ, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থল, ভূত্বকের উচ্চনীচতা, টিউবওয়েলের তথ্য ও ভূগর্ভস্থ জলের বয়স— এসবের সঙ্গে স্যাটেলাইটের ছবি মিলিয়ে সমীক্ষকরা সরস্বতী নদীর গতিপথ নির্ণয় করেছেন। ▯

শোকসংবাদ

গত ২৪ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার মাদপুর খণ্ডের নিবড়া শাখার স্বয়ংসেবক গৌরহরি অট্ট মাত্র ৫৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও ভাইদের রেখে গেছেন। প্রায় ১৫ বছর স্বস্তিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে গুরুপূজন না হওয়ার জন্য তার আপশোস রয়ে গেল। তিনি তা অকপটে স্বস্তিকার প্রতিনিধির কাছে ব্যক্ত করেছেন।

* * *

হাওড়ার প্রবীণ স্বয়ংসেবক গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। বাল্যাবস্থা থেকেই স্বয়ংসেবক। তিনি হাওড়া মহানগর সম্পর্ক প্রমুখ, নগর সঙ্ঘচালক-সহ নানা দায়িত্ব সামলেছেন। মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন এবং বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্যস্তরে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মিশুকে স্বভাবের গোপীনাথদা বিভিন্ন ক্লাব-সংগঠন ও সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি সহধর্মিণী, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ ও নাতিকে রেখে গেছেন।

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ১১।।

গুরুজী বাড়িতে থাকলে...

...ঘণ্টার পর ঘণ্টা সংগীত সাধনায় ডুবে থাকতেন।

রোজ সকালে গঙ্গার ধারে প্রাতঃভ্রমণে যেতেন গুরুজী। একদিন বেড়ানোর সময় বৃষ্টিতে ভিজে গেলেন।

কাপড় বদলে নাও।

বন্ধুর দেওয়া ইস্ত্রি করা প্যান্ট পরে পা মুড়ে মাটিতে বসে পড়লেন গুরুজী।

যার ফলে প্যান্টের ভাঁজ নষ্ট হলো এবং বন্ধুটি বিরক্ত হলেন। ব্যাপারটা গুরুজী লক্ষ্য করলেন—

তোমার প্যান্ট ফেরত নাও ভাই। আর দেখো যাতে প্যান্টের ভাঁজ না নষ্ট হয়।

শরীরের জন্য জামাকাপড়। জামা কাপড়ের জন্য শরীর নয়।

অন্তর্বাস পরেই বাড়ি ফিরলেন।

১৯৩১ সালে, গুরুজীর দৃষ্টিহীন বন্ধু ভসন রাওয়ের চোখে অস্ত্রোপচারের জন্য বোম্বাই যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল—

কেউ সঙ্গে না গেলে আমি একা কী করে যাব?

আমি তোমার সঙ্গে যাব।

বন্ধুকে সাহস জুগিয়ে গুরুজী ওর মনের জোর বাড়িয়ে দিলেন।

চলবে